আলোকে আঁধারে

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

প্রাপ্তিস্থান
বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩২৮

মূল্য ১।০ টাকা

প্রকাশক
শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
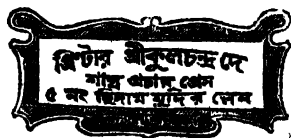
সোদরোপম

শ্রীমান্ অহীন্দ্রকুমার বসাক

স্নেহাস্পদেষু

উপহার

আলোকে আঁধারে

—১—

সাতদিনের দিন ভোরে কুমুদ আঁচলের রিঙের একটি চাবী দিয়া ক্যাসবাক্সটি খুলিয়া ফেলিল। নিজের সম্পত্তি, আবাল্য সেটিকে নাড়াচাড়া করিলেও হঠাৎ কুমুদ আজ শুষ্ক পাণ্ডুর হইয়া গেল। কোন মতে চোখের জল বামহাতে মুছিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া একটি পয়সা কপালে স্পর্শ করাইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। বুক ঠেলিয়া ঠিক গলার নীচেই একটা সশব্দ মেঘ উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল, পাছে কান্নার শব্দে প্রিয়তমের ভোরের নিদ্রাটি ভাঙ্গিয়া যায়—এই আশঙ্কাতেই সে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

আজ সাতদিন কুমুদ স্বামীকে যমের আমন্ত্রণ হইতে আগুলিয়া রক্ষা করিতেছে। আপাততঃ শমন রাজা সতীরাণীর কাছে পরাস্ত মানিয়া বিশুষ্কমুখে প্রত্যাগত হইয়াছেন—অজয়ের প্রাণের আশা ফিরিয়াছে। স্বামী তাহার ৬৫৲ টাকা বেতনে যে আফিসে দশটা পাঁচটা মুখের রক্ত

তুলিয়া খাটিতেন, দয়াপরবশ হইয়া যদি তাঁহারা এক মাসের বেতন অগ্রিম না দিতেন, তাহা হইলে কি যে হইত ভাবিতেও কুমুদ আড়ষ্ট হইয়া যায়। এ কয়দিন যখনই সে ভগবানের দয়া প্রার্থনা করিয়াছে, আফিসের সাহেব বাবুদেরও মঙ্গল কামনা করিতে বিরত হয় নাই কিন্তু আজ যে অভাগিনী নিঃসম্বল। আজ তাহার বাক্সে অনেক দিনের অচল আনি একটা ছাড়া কিছুই নাই। অথচ আজ অজয়কে পক্ষীবিশেষের একটু ঝোল দিতেই হইবে। ডাক্তার আসিয়া ক্ষতটাও ধুইয়া দিবেন, তাঁহাকে দু'টি টাকা না দিলেই নয়! পথ্যই বা কি হয়, এরই বা কি করি—আবার কুমুদ কাঁদিল।

দেহ অলঙ্কার শূন্য করিয়াছে; গৃহ তৈজস হীন, একটু ভালো বস্ত্রও একখানি নাই যে কোন আশা করিতে পারে, হঠাৎ একটা জিনিষে নজর পড়িতেই কুমুদ চক্ষু মুছিল। এ কথাটা ক'দিনই তাহার মনে হইয়াছে, কুমুদ সবলে সেটিকে বিদূরিত করিয়াছে কিন্তু তাহা ছাড়াই বা উপায় কি? কে তাহাকে বলিয়া দিবে!

অজয়ের নড়া-চড়ার শব্দ পাইয়া ছুটিয়া ঘরে আসিয়া দেখিল অজয় অত্যন্ত নিস্তেজভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। কুমুদ মুখের কাছে মুখ আনিয়া কতবার জিজ্ঞাসিল, কতবার দুটি করতলের মধ্যে মুখটি টানিয়া চুম্বন করিল, বুকের উপর হাত রাখিয়া যেন এখনই কথা কহিতেছিল, এমনই বিহ্বলের মত বলিল—ঘুমুলে হ্যাঁগা,—ডাক্‌ছিলে আমাকে?

অনেকক্ষণ পরে অজয় পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিবামাত্র কুমুদ সযত্নে তাহাকে শোয়াইয়া দিল। হাত দুটি তুলিয়া লইয়া বলিল—কেমন আছ?

আঁধারে

১

অজয় বলিল—আমি চল্লুম কুমুদ······

না গো ওকথা বল না, বল না, তুমি যে সেরে গেছ। ওসব কথা ভেবো না। কি কষ্ট হচ্ছে বল?—মাথাটি টিপে দি একটু।

অজয় আস্তে আস্তে বলিল—সবাই বলছে আমি সেরে গেছি আমি বুঝছি ঠিক তার উল্টো। কুমুদ আমি ত তোমাকে প্রতারিত করতে পারব না, কুমুদ, আমার সময় হ'য়েছে। আমি তোমাকে সুখী করতে পারিনি কুমুদ, তবু আমি তোমার স্বামী, তোমাকে একেবারেই পথে এনে দাঁড় করিয়েছি, আমার পরে যা ঘটবে তাও বেশ বুঝ্‌ছি। তবু ও কুমুদ, আমার কুমুদ, আমার কাল উত্তীর্ণ······

কুমুদ তাহার মুখটি চাপিয়া বলিল—মিছে কথা। দেখ্‌ছ আমার নোয়ার পানে দেখ্‌ছ, বল দেখি সে কি ম্লান হ'য়েছে, না সমান উজ্জ্বল! সমান, উজ্জ্বলের চেয়েও বেশী, উজ্জ্বলতর।

অজয় কুমুদের কৃশ হাত খানির উপর হাত রাখিয়া বলিল—কিন্তু কি করে হ'বে কুমুদ? ডাক্তার কাল কি বলে গেছে জান ত? এখনও দশবারো দিন—কেমন করে তুমি চালাবে কুমুদ?

কুমুদ উত্তর দিতে পারিল না, নীরবে নতমুখে ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল—যেমন করে পারি চালাব, তার জন্য তোমাকে আমি ভাবতে দেব না। কিছুতেই না।

অজয় আর কথা কহিল না। তাহাকে কুমুদ ভাবিতে দিবে না, কিন্তু না ভাবিয়া সে থাকিতে পারে কৈ? আফিসের টাকাটায় সাতদিন চলিয়াছে, আর যে কিছুই নাই ইহাও কাল সে ডাক্তারের সঙ্গে কুমুদের কথাবার্তায় বুঝিয়াছে। ডাক্তার, সাহেব ডাক্তার সকলে মিলিয়া কুমুদের

ক্যাসবাক্স খালি করিয়াছেন তাহা কুমুদ নিজের মুখেই কাল বলিয়াছে—"আর বড় সাহেব ডাক্তার কোত্থেকে আনাব ডাক্তার বাবু? আমার যে আর কিছু নেই—আপনি দয়া করে দেখ্‌বেন আমার হাতের নোয়া যেন অক্ষয় হয়ে থাকে।"

অজয় জিজ্ঞাসিল—আজ কি ডাক্তার আস্‌বে?

আসবেন বৈ-কি। ঘা-টা না ধুলে ত চল্‌বে না।

অজয় বলিল—কুমুদ, তুমি ধুতে পার না?

কুমুদের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল, মৃদুকণ্ঠে কহিল—পারব না কেন? কিন্তু যদি হিতে বিপরীত হয়? ও বড় শক্ত ব্যামো সাহস হয় না।

অজয় বলিল—কার্ব্বাঙ্কলে কেউ বাঁচে?

কুমুদ দৃঢ়স্বরে বলিল—আর কারু খবর আমি রাখিনে, বলতেও পারিনে। একটু থামিয়া, একটু পরে সে মিনতিপূর্ণস্বরে বলিল—তোমার মুখে কি অন্য কথা নেই?

অজয় চুপ করিল। কুমুদ বলিল—একটু খানি চুপ করে শুয়ে থাক, আমি কাপড় চোপড় ছেড়ে একটু চরণামৃত এনে তোমাকে খাইয়ে দিই। লক্ষ্মিটী আমার, উঠো না যেন। আমি এখনই আসছি কাপড় কেচে—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। বাহিরে দাঁড়াইয়া দু'মিনিট কি ভাবিল, তারপর আবার অজয়ের ঘরে ঢুকিল। অজয়ের চক্ষু নিমীলিত, সে জানিতেও পারিল না। দেওয়ালে আলনায় ঝুলানো পাঁসটে রঙের কোটের বুকপকেট হইতে পেন্সিলটি টানিয়া লইল। একবার জামার দিকে একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। এই রকম দশ বছর সে জামার পকেট হইতে পেন্সিল টানিয়া লিখিয়াছে,

আজ সে পেন্সিলটা লইয়াই চলিয়া আসিতে পারিল না। আলনা-বিলম্বিত জামাটি, পকেটে রক্ষিত পেন্সিলটি, শয্যাশায়িত রুগ্নস্বামী একত্র হইয়া তাহার সমস্ত হৃদয় আলোড়িত করিয়া ফেলিল। রবিবারেও অজয়কে অফিসে যাইতে হইত, তাহা লইয়া কতদিন স্বামী স্ত্রীতে বচসা হইয়াছে, কতদিন জামা লুকাইয়া আফিস যাওয়া বন্ধ করিয়াছে সব মনে পড়িয়া গেল। কেরাণীর স্ত্রী, আফিসের মর্য্যাদা বুঝিত, তবুও একটি দিন স্বামীর বিশ্রাম নাই বলিয়াই আফিসের উপর কুমুদের রাগের সীমা ছিল না। আজ সে বলিল, ছুটির দরকার নেই, সেরে উঠে তুমি রোজ আফিস যেও তা'তেই আমি সুখী হ'ব। কোনদিন কোন কথা বলব না। তাহার যেন ভয় হইতেছিল, তাহারই অনিচ্ছা জানিয়া নির্দ্দয় বিধাতা এমন করিয়া আফিসের পথ বন্ধ করিয়াছেন!

কাগজ পেন্সিল লইয়া একখানা চিঠি লিখিয়া সে পাশের বাড়ীর যে জানালাটি এই দিকে খুলিয়াছিল, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। জানালার নীচেই কুমুদের সমবয়স্ক একটি বধূ উনানে কড়া চড়াইয়া রাঁধিতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল—কেমন আছেন, কুমু?

সেই রকমই আছেন ভাই। বৌদি, একবার অনিলকে ডেকে দেবে?

অনিলকে? দেখি দাঁড়াও—বলিয়া বধূটি সরিয়া গেল। একটু পরেই আঠারো উনিশ বছরের একটি ছেলে জানালায় মুখ বাড়াইয়া বলিল কি বৌদি?—পাশাপাশি এই দু'টি গৃহস্থের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এতই বেশী ছিল যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ—জাতিভেদ তাহারা মানিতই না।

একটি কাজ করতে পারবে? এই চিঠিখানা এলগিন রোডে সুরেন রায়ের বাড়ীতে দিয়ে আসবে?

এর্লগিন রোডে ? কোন্ সুরেন রায় ? কাউন্সিলের মেম্বর যে !

তা হ'বে। পারবে ?

অনিল একটু ভাবিয়া বলিল—পারব না কেন ? পারব ! কিন্তু বারোটার সময় গেলে হবে কি ? আমার কলেজ যে আজ দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্য্যন্ত।

কুমুদ বলিল—তাই হ'বে ভাই। বারোটার সময়ই যেও। আর দেখ, যদি একটা জবাব দেয়, নিয়ে এসো। বলিয়া সে আস্তে আস্তে চিঠিখানি দিল।

জবাব দেবে ত ?

দেবে বোধ হয়—বলিয়া অত্যন্ত সসঙ্কোচে কুমুদ সরিয়া গেল। চিঠির উপরে লেখা ছিল, শ্রীমতী আলোকময়ী কল্যাণীয়াসু ! অতীতের ইতিহাসে বলে, আলোক কুমুদের কনিষ্ঠা ভগিনী। এ-হেন বিপদের সময়েও একমাত্র সহোদরার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও যে সে নিঃসঙ্কোচ হইতে পারিল না তাহার কারণ বুঝাইতে হইলে সামান্য কিছুদিনের পূর্ব্ব ঘটনা বিবৃত করিতে হয়।

—২—

বিধবার মেয়ে কুমুদের সঙ্গে যখন তাহার বিবাহ হইয়াছিল, অজয় দুই তিনটি আত্মীয় পুরুষ ছাড়া কাহাকেও দেখে নাই। তাহার বিবাহের দেড়বৎসর পরে যখন শ্বশ্রূর মৃত্যু হয় তখনও কোন আত্মীয় আত্মীয়ার সন্ধান সে পায় নাই। তাহার শ্বশ্রূ মৃত্যুকালে কেবলই আলোক, আলোক করিয়াছিলেন, তখনই অজয় জানিতে পারে যে শৈশবেই আলোক তাহার ধনী মাসীগৃহে নীত হইয়াছিল এবং কোন বিদেশে বাস করে।······কয়েক বৎসর পরে একখানি নিমন্ত্রণ পত্রে কেবলমাত্র জানিতে পারে—সুরেন রায়ের সঙ্গে আলোকের বিবাহ! কেহ তাহাদের লইতেও আসে নাই, কষ্ট করিয়া সংবাদটা বাড়ীতে দিয়াও যায় নাই—দুই পয়সার ডাকটিকিটে পিওনের হাতেই কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। কুমুদের পীড়াপীড়িতে তবুও অজয় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যায়, কিন্তু সেখানে অভ্যর্থনার চূড়ান্ত পাইয়া, রাত্রে পত্নীকে বলিয়াছিল—কুমুদ, গরীব আমরা, তবু এত অপমান কেউ করে নি, যা আপনার লোক আজ করেছে।

কুমুদ বলিল—তাঁরা যে চেনেন না!

অজয় সে লজ্জার কথাও বলিল—আমি নিজে সুরেন বাবুকে পরিচয় দিলুম, বল্লে—আই সি! ব্যস্। বরযাত্রী সব মোটরে চড়ল, আমাকে

একবার কেউ বল্লেও না—সব চলে গেল, আমি ফিরে এলুম। কেন আমাকে পাঠালে কুমুদ?

কেন পাঠাইয়াছিল কুমুদ সে কথা অজয়কেও বলিতে পারিল না। কোন কথা না বলিলেও কেবলমাত্র তাহার চোখের অপলক-বিষণ্ণ দৃষ্টিতেই অজয় বুঝিতে পারিয়াছিল, কৃত অপরাধের অনুশোচনায় তাহার চিত্ত ভরিয়া গিয়াছে। তদবধি আর কোন কথাই হয় নাই, সে আজ চার বৎসরের কথা। দরিদ্রের অভিমান, দরিদ্রের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের মধ্যে আর কোনদিনই ধনীর কথা উত্থাপিত হয় নাই। আফিস ফেরৎ অজয় রোজ একখানি দৈনিক বাঙ্গালা সংবাদ পত্র আনিত, রাত্রে বিছানার পাশে আলো রাখিয়া কুমুদ কতদিন ভগ্নীপতির নাম, কাজ সব পড়িয়াছে কিন্তু স্বামী স্ত্রী কেহই কাহাকেও সে কথা বলে নাই।

হঠাৎ আজ দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুতের মতই সেই কথাটি কুমুদের মনে পড়িয়া গেল। সুরেশ রায় যেই হোক, যেমনই হোক, আলোক তাহারই মাতৃগর্ভে জন্মিয়াছে, দু'জনের শরীরে একই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, সে কি এ বিপদে তাহাদের উপেক্ষা করিতে পারিবে! কখনই নয়! আলোককে কুমুদের বেশী স্মরণ হয় না, কেবল মাত্র তাহার সুন্দর কোমল চোখ দু'টি মনে পড়ে। তেমন স্নিগ্ধ চোখ একমাত্র জননী ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কুমুদ আর কাহারই দেখে নাই।

কত আশা আশঙ্কার মধ্য দিয়া মধ্যাহ্ন সূর্য্য হেলিয়া পড়িল, কুমুদ একটু মিছরির সরবৎ খাইয়া অজয়ের বিছানায় বসিয়াছিল, শুনিতে পাইল, অনিল ডাকিতেছে—বৌদি!

কুমুদ লাফাইয়া উঠিল। নীচে নামিতে তাহার পা যেন উঠিতেছে

না, কোনমতে আসিয়া দাঁড়াইল। অনিল বলিল—জবাব পাই নি বৌদি!

পাও নি?

না। অনেকক্ষণ বসে রইলুম কেউ কোন খবর দিলে না দেখে চাকরটাকে পাঠালুম, সে ফিরে এসে বল্লে ছোটরাণী বড় ব্যস্ত। বাবু ব্যারাকপুর ঘোড়দৌড়ে যাচ্ছেন, এখন তাঁর সাবকাশ নেই।

ছোটরাণী কে?

যাকে তুমি লিখেছিলে। সরকার ঠিকানা পড়েই একটা খানসামা ডেকে বল্লে ছোটরাণীকে দিয়ে আয়।

কুমুদের চক্ষের দৃষ্টি লুপ্ত হইয়াছিল। আলোক ছোট রাণী! তাহার স্বামী ঘোড়দৌড়ে যাইতেছেন, সাবকাশ নাই! তাই বলিয়া সে দশটা টাকাও ভিক্ষা দিতে পারিল না? আলোক—ছোটরাণী, জন্ম জন্ম সে তাই হোক্—কিন্তু সে ত তাহারই মায়ের মেয়ে!

অনিল জিজ্ঞাসিল—ছোটরাণীর সঙ্গে বুঝি তোমার ছেলেবেলার ভাব ছিল, না-বৌ-দি!

হ্যাঁ—বলিয়া কুমুদ দ্রুত প্রস্থান করিল। অজয় নিদ্রিত, তাহারই বিছানায় পড়িয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া কুমুদ চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল।

শুইয়া শুইয়া তাহার শঙ্কা হইতেছিল, হয়ত আলোকের হাতে চিঠি পড়ে নাই—অন্য কেহ পাইয়াছে। আলোক ছেলেমানুষ, সে-ই কি ছোট রাণী? কিন্তু অনিল যে তাহাই বলিয়া গিয়াছে।

আবার অনিলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অনিল সেই কথাই

বলিল। অধিকন্তু বলিয়া গেল, বড়লোকের কাণ্ড তুমি জান-না বৌদি। তাদের মধ্যে অনেকে মানুষই নয়।

কুমুদ জিজ্ঞাসিল—তুমি নিশ্চয় বল্‌তে পারো, ঠাকুরপো, আলোক চিঠি পেয়েছে?

পেয়েছে গো পেয়েছে। চাকরটা বল্লে—বাবু রেসে যাবার পোষাক পরছিলেন, ছোটরাণীর হাতে সে চিঠি দেখে এসেছে।

তবে পেয়েছে, পড়েওছে?

নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।—বলিয়া অনিল জিজ্ঞাসিল—ডাক্তার এসেছিল?

এসেছিলেন।

কুমুদ আর অপেক্ষা করিল না। আলোক চিঠি পাইয়াছে! তবুও-তবুও! যাক্—এক সান্ত্বনা স্বামী এ নিদারুণ অপমানের ইতিহাসটা জানিতে পারেন নাই।

কিন্তু সে সান্ত্বনায় ত কাজ চলিবে না। সে-যে কত আশা করিয়া বসিয়া আকাশের রৌদ্রের মাপ-জোপ করিতেছিল। এত বেলা অবধি খোট্টা ঝিকে বাড়ী যাইতে দেয় নাই, আটকাইয়া রাখিয়াছে। টাকাটা আসিলেই তাহাকে বাজারে পাঠাইয়া দিয়া, নিজে উনানে আগুন দিবে! তাহার সব আশা ভরষা এক নিমিষে কোথায় খা খা করিয়া মধ্যাহ্ন-সূর্য্য-তপ্ত বাতাসের মত উধাও হইয়া গেল! হা রে আশা, হা রে বোন্! —টপ্ টপ্ করিয়া বুকের রক্ত যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া চোখ দিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। হায় বড়লোক! সে রেসে যায়, সে মোটর চড়ে, তাহার পায়ের নীচে যে পৃথিবী সে কি তাহার চোখেও পড়ে না!

মনে পড়িল, না, না, এ কখনই সম্ভব নয়। আলোক যে তাহারই স্বর্গগত জননীর সন্তান! মায়ের অত বড় হৃদয়খানির একাংশের স্নেহ দয়া মায়া তা'ও কি আলোক পায় নাই? সে কি মায়ের গর্ভে বৃথাই আসিয়াছিল! ইহাও ত হইতে পারে, আলোক স্বাধীন নয়! পাঁচ জনের মুখ চাহিয়া মত লইয়া তাহাকে চলিতে হয়! সেই পাঁচজনের ত আমরা কেহ নহি! তাহারা এ দরিদ্রের মূল্য বুঝিবে কেমন করিয়া! আর তাহারা না বুঝিলে আলোকই বা কি করিবে!

এ সব তর্কে মন সায় দিল, কিন্তু যে মনের মন হৃদয়ের হৃদয় হৃদয়ের জ্বলন্ত চুল্লীতে কটাহ চড়াইয়া স্বামীর পথ্য প্রস্তুত করিতে বসিয়াছিল, সে ত নিকটে শায়িত মুদিত নেত্র রুগ্ন জীর্ণ স্বামীর মুখ চাহিয়া কোন সায়ই দিল না, কোন কথাই বলিল না। কেবল তাহারই আগুনে তাহাকেই পুড়াইয়া মারিতে লেলিহান হইয়া উঠিল।

—৩—

আলোক চিঠি পাইয়াছিল। দু'তিনবার পড়িয়া সে যখন নিজের ঘরে প্রবেশ করিল, সুরেন্দ্র পাশের পোযাক কামরায় আর্শির সামনে দাঁড়াইয়া টাই বাঁধিতেছিল। আলোক কিছুমাত্র ভুমিকা না করিয়াই কহিল—তুমি কি বড় গাড়ীখানায় যাবে? আমি দিদির বাড়ী যাব। ছোটগাড়ীখানা ঠিক আছে ত?

যেন দিদির বাড়ী যাওয়া তাহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে, এমনই ভাবে সে কথা কয়টি বলিল। সুরেন্দ্র বলিল—কোন্ দিদি?

আমার দিদি।

ওঃ! সেই অজয় বাবু……

হ্যাঁ—বলিয়া আলোক ড্রয়ার খুলিয়া কয়েকখানা নোট, টাকা বাহির করিয়া আঁচলে বাঁধিল।

সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসিল—হঠাৎ আজ?

অজয় বাবুর অসুখ, দিদি চিঠি লিখেছেন।

আঁচলের দিকে চাহিয়া সুরেন্দ্র বলিল—বুঝেছি।

আলোক দীপ্তকণ্ঠে কহিল—বোঝবারই কথা। তাঁরা গরীব সে ত সবাই জান।

সুরেন্দ্র নিজের নোট-কেস্, রেসিংবুক পকেটে গুঁজিয়া নামিয়া গেল। আলোক ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল—পতিত বাবুকে বল ছোটগাড়ী নিয়ে আসুক।

পাঁচমিনিটের মধ্যেই মোটর অন্দরের দ্বারে দাঁড়াইয়া ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল। আলোক উঠিয়া বসিয়া বলিল—ঈশ্বর সেনের গলি জানেন?

জানি—বলিয়াই পতিত মোটরে ষ্টার্ট দিল। আলোক চিঠিখানি আর একবার পড়িল। মোটর উঠিতেছে, নামিতেছে, দুলিতেছে, তবুও আলোক একটানেই পড়িতে পারিল :

"৫।১ নং ঈশ্বরসেনের গলি,
মঙ্গলবার, কলিকাতা।

কল্যানীয়াসু,

আমার নাম দেখে তুমি আমাকে চিন্তে পারবে না, আমি তোমার দিদি, তোমার চেয়ে ছ'বছরের বড়। তুমি ছেলেবেলা থেকেই নতুন মাসীমার কাছে ছিলে, আমাকে দেখই নি।

তুমি আমার মার পেটের বোন্, তবু তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে কেমন আমার সঙ্কোচ হচ্ছে। তবে মানুষ বিপদ কালে শত্রুরও আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না, আমিও তোমার শরণ নিচ্ছি। বোন্ আমার কপালে বিধাতা কি লিখেছেন জানি না, আজ সাতদিন ধরে আমার সিঁথির সিঁদুর হাতের নোয়া নিয়ে টানা হেঁছড়া চলছে, তার মধ্যে একা আমি, অসহায়, নিঃসম্বল। সোনার মধ্যে বাঁ হাতের নোয়া ঢাকা একচিলতে

সোনা আছে, নোয়া না খুল্লে সেটুকুও পাবার ভরষা নেই—তাই বা পারি কেমন করে?

বোন, এই পত্রের বাহক যিনি, তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান, আমার দেবর-সম্পর্কীয়। বড় আশা করে তাঁকে তোমার কাছে পাঠালুম, অভাগিনী ভগিনীর প্রতি তোমার যা কর্ত্তব্য জানি-ও।

ইতি তোমার দিদি—"কুমুদ।"

একটা গলির মধ্যে আসিয়া পতিত জিজ্ঞাসিল—কত নম্বর?

আলোকের দৃষ্টি অত্যন্ত ক্লান্ত, সজল, সে চিঠিখানা খুলিয়া বলিল পাঁচের এক।

এই যে!...এই ঝি...

একটা খোট্টা ঝি সামান্য দু'একটা কি জিনিষ হাতে দ্বার বন্ধ করিতেছিল, পথহারা ভাবিয়া সে দ্বার খুলিয়া কহিল—কাঁহা যাগা?

ততক্ষণে আলোক নামিয়া পড়িয়াছিল। ঝি মাগীর একেবারে চোখ্ কপালে উঠিয়াছে, এমন রূপ, এমন সৌষ্ঠব, এমন পরিপূর্ণ যৌবন অভাগিনী কস্মিনকালেও দেখে নাই। আলোক তাহার পাশে আসিয়া বলিল—চল। সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, ঝি!

ঝি মাগীর মুখে কথা সরে না। একদৃষ্টে চাহিয়া আছে দেখিয়া আলোক একটা ধমক দিয়া কহিল—কোথাকার মাগীরে তুই! হাঁ করে কি দেখ্ছিস্?

এ কথায় মাগীর সৌন্দর্য্যতৃষা একদম্ ছুটিয়া গেল। তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া বলিল—হিঁয়াই......

মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, কুমুদ আলোকের হাত ধরিতেই

আলোক নত হইয়া পাদস্পর্শ করিল। কুমুদ ভগ্নীকে বুকে জড়াইয়া চুম্বন করিয়া বলিল—তুই এসেছিস্ আলোক ?

আলোক সে কথার উত্তর না দিয়াই বলিল—কি অসুখ দিদি ? ডাক্তার এসেছিল ?

হ্যাঁ। আমাদের পাড়াতেই ঐ যে বীরেন ডাক্তার আছেন, তিনিই দেখছেন। ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু ডাক্তার ভাল, হাতযশও আছে।

না—না, এখনি সাহেব ডাক্তার আসুক। ও সব বাজে ডাক্তারের উপর ভরসা করে থাকা কিছু নয়, তারা না পারে রোগ চিন্তে, না পারে লোভ সামলাতে ! এই ঝি, মোটর বাবুকে ডাক্ ত !

পণ্ডিত বাবু আসিলে আলোক সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিল এখনি গাড়ী লইয়া হোয়াইট সাহেবকে ডাকিয়া আনিতে। বাবুর নাম লইতেও বলিয়া দিল।—হ্যাঁ হ্যাঁ, আর একটা কাজ করবেন, ডাক্তারের ওখান থেকেই বাড়ীতে টেলিফোন করে দুটো চাকরকে এই ঠিকানায় আস্‌তে বলবেন। বল্‌বেন আমার হুকুম, যে হোক দু'জন যেন এখনি চলে আসে।

আলোকের বয়স বছর আঠারো উনিশ হইবে। কুমুদ ছোট বোনটির নিরুপম মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে মুখের অনুপম সৌন্দর্য্যের মধ্যে সে কি পাঠ করিল, কে-জানে কিন্তু বুঝিতে পারিল এই আলোকময়ীর আগমনে তাহার হৃদয়ের আশঙ্কা অনেক কমিয়া গিয়াছে। সে যেন অনন্ত আশা-ভরষা স্বাস্থ্য শান্তি সব ওই সুন্দর মুখের লাবণ্যের মত মাখাইয়া আনিয়াছে।

আলোক বলিল—কোন্ ঘরে দিদি ?

এই যে, এই ঘরে, এখন একটু ঘুমিয়েছেন।

তবে থাক্ একটু পরেই যাব।

তখন দুই বোনে কথাবার্ত্তা হইল. এইরূপ :—

কুমুদ বলিল—সুরেণ বাবু শুনেছেন ?

আলোক জবাব দিল শুনেছেন।—কুমুদের ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করে তিনি একবার আসিবেন কি না কিন্তু পারিল না। সে ত চায় যে কোন আত্মীয় যদি কেবলমাত্র মুখের ভরষাও তাহাকে দিয়া যায় সে শতগুণ বল পায়—কিন্তু নিজের ভগ্নীপতির প্রসঙ্গে এ কথাটি বলিতে পারিল না। স্বামীর সহিত তাহার মনান্তরের কথাও ত সে ভুলে নাই।

হঠাৎ এক সময়ে আলোক বলিল—কি পাষাণ তুমি দিদি! এমনি করে' ছোট বোনকে চিঠি লেখে ? এ যেন কোথাকার কে পরের কাছে লিখছ! অত কাকুতি মিনতি · ···

কুমুদ চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল—কখনই চেনা শুনা ছিল না যে! কি জানি আমার ত মনেই হ'ত যে চিরদিন আমরা এমনি খাপছাড়া, কারু সঙ্গে কোন যোগ নেই—হয়ত ভাবের প্রাবল্যে সে অশ্রু-রুদ্ধ হইয়াছিল নতুবা এই সাতদিনের উৎকণ্ঠা পতিসেবাপরায়ণতার গোপন গৌরব-কাহিনী আত্মা ছাড়া কাহাকেও জানাইবে না এমনি ভাবে কি বলিতে কি বলিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

—৪—

আলোক সাহেব ডাক্তারকে বিদায় দিয়া বিছানার পার্শ্বে আসিতেই অজয় ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসিল—তুমি আলোক ?

আলোক আব একটু অগ্রসর হইয়া বলিল—কি মনে হয় ?

অজয় ডাকিল—কুমুদ,—বলিতে বলিতে তাহার রোষক্ষুব্ধ স্বর নম্র হইয়া গেল, বলিল—তোমরা দাঁড়িয়ে কেন ?

আলোক বসিল। অজয় চিরদিনই অল্পভাষী, একটি কথা বেশী বলিতে তাহার যেন মাথা কাটা যায়। সে যা দুই একটা কথার জবাব দিল সে তো না পারিল তাহার অর্থ করিতে, না পারিল তাহাতে সায় দিতে। কুমুদ দু'জনের (নিজের এবং স্বামীর) হইয়াই আলোকের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল।

আলোক যে প্রাণপণে রোগের সেবা করিতে শিখিয়াছে, এবং সে কার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে, কয়ঘন্টার মধ্যেই কুমুদ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। যতক্ষণ সে রহিল, নিজের হাতেই সব করিল, ন'টার পরে স্বহস্তে পাক করিয়া কুমুদকে খাওয়াইয়া নিজে আহার করিল। ঘরে আসিয়া বলিল—এখন আসি দিদি, কাল সকালেই আবার আসব। আমার মধু চাকরটা থাকবে এখানে, এর মধ্যে কোন কিছু দরকার হ'লেই ও'কে বলবে।

অজয়ের রোগজীর্ণ হাতটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল—আজ যাই?

অজয় সাড়া দিল না। সে হয়ত শুনিতেই পায় নাই, চক্ষু মুদ্রিত।

বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছে--বলিয়া কুমুদ আলোটা মুখের অতি সন্নিকটে আনিয়া দেখিতে লাগিল। ক'দিনের পর স্বামীর চোখে নিদ্রা আসিয়াছে জানিয়া তাহার কম্পিত হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে গভীর নিঃশ্বাস উঠিয়া বলিল—এ তোরই গুণে আলোক সাত দিন পরে চোখের পাতা বুজেছেন। রাত যে কি করে কেটেছে বোন্ কি আর বলব তোকে! তাহার চক্ষুপল্লব ভিজিয়া গিয়াছিল।

আলোককে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া কুমুদ ফিরিয়া আসিতেই অজয় ডাকিল—কুমুদ!

কুমুদ চমকিয়া উঠিয়া বলিল—তুমি জেগে আছ? ঘুম এল না?

সে কথার উত্তর না দিয়াই অজয় কহিল, তুমিই খবর পাঠিয়েছিলে আলোক-কে?

একমুহূর্ত্তে মনের উল্লাস মুখের সমস্ত হর্ষদীপ্তি লইয়া অন্তর্ধান করিল, কুমুদ নীরব।

অজয় আবার তৎক্ষণাৎ বলিল—এবার যেন আশা হচ্ছে সারব।

কুমুদ অকূলে কূল পাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, বলিল সারবে বৈ কি! শুন্‌লে ত সাহেব ডাক্তার তোমার সামনেই বল্লেন, বিপদ কেটে গেছে।

শুনেছি—বলিয়া অজয় চুপ করিল।

যতবারই আলোকের স্নেহপূর্ণ ব্যবহার মনে পড়ে, তাহার কমনীয় সৌন্দর্য্য, ভগ্নীপ্রীতি সমস্ত মিলিয়া কুমুদের শ্রান্ত চিত্ত তাহারই ধ্যানে

আকৃষ্ট মোহাবিষ্ট হয়! এমন সুন্দর, এমন কোমল ছোট বোন্‌টি তাহার এতদিন কতদূরে ছিল, লুপ্ত রত্নের মত আজ সে হাতের কাছে নিজের জ্যোতিঃতে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কুমুদ সারারাত সেই কথাই ভাবিয়াছে। আর মনে মনে দুই কর জোড় করিয়া তাঁহার কাছে গোপনে, কাতরে প্রার্থনা করিয়াছে, এ আলোকে যেন আর সে বঞ্চিত না হয়!

অতীতের অন্ধকারময় জীবনটা আজ অতি বিশ্রী কদর্য্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পৃথিবীতে এক জাতের মানুষ আছে যাহারা আলোকেই থাকিতে চাহে; অন্ধকার প্রয়োজনশূন্য অসাড় বলিয়া বিবেচিত হয়।

—৫—

বাড়ী আসিতে দশটা বাজিয়া গিয়াছিল, আলোক শয়নকক্ষে আসিয়া দেখিল, তখনও স্বামী আসেন নাই। ভৃত্য সংবাদ দিল, বাবুর মোটর ফিরিয়া আসিয়াছে, রাত্রি হইবে, তিনি ট্যাক্সি করিয়া ফিরিবেন। এরকমের খবর নূতন নহে। কিন্তু এই বহুপরিচিত, বহুশ্রুত সংবাদটিই আজ আলোককে নূতন ব্যথা জানাইয়া দিল। এত সকালে ফিরিয়াছে বলিয়া নিজেরই কেমন একটা অস্বস্তিবোধ হইতে লাগিল। শরীরটাও ছিল আজ ভারি শ্রান্ত, বিছানায় পড়িতেই নিদ্রিত হইল। কখন্ স্বামী ফিরিয়াছেন, তাহাকে ডাকিয়াছেন কি-না সে কিছুই জানে না, ভোরে ঘুম ভাঙিতেই দেখিল ও পাশের খাটে তিনি শুইয়া আছেন। আলোকের ইচ্ছা হইল, এখনি তাঁহাকে জাগাইয়া সব কথা বলে। তাহার অলস কর্ম্মহীন জীবন একদিনে এমনই সাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল যে সে কিছুতেই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। আবার কখন যাইবে, কখন্ সকলের আশঙ্কা উৎকণ্ঠার মধ্যে নিজের অসামান্য কৃতীত্ব দেখাইয়া নিজেকে ধন্য করিবে, তাহাদেরও সুখী করিবে তাহারই আকুল আকাঙ্ক্ষায় সে আর কিছুতেই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না। নিদ্রিত স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া জাগাইয়া দিল। অন্যদিন এ

অবস্থায় যে সব কথা হইত, আজ তার সে সব কিছুই হইল না। আলোক একেবারেই বলিল—আমার ফিরতে কাল দশটা বেজেছিল।

সুরেন কহিল—আমি ফিরে দেখি তুমি ঘুমোচ্ছ···

আলোক বাধা দিয়া বলিল—আমাকে পেয়ে যে দিদি কি সুখীই হয়েছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং স্নান করিয়াই পুনরায় যাইতে হইবে তাহাও জানাইল।

সুরেন রায় এ বছর কাউন্সিলের কি রকম কন্টেস্‌টেড্‌ ইলেক্‌সান্‌ হইবে, কে কে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী এই সবেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, আলোক তাহাতে মন দিতে পারিল না। বিবাহ হওয়াবধি সে এই সবই শুনিয়া আসিয়াছে—কতটাকা থাকিলে অমুক লাহিড়ী কি করিতে পারিত, লাহারা ছ'খানা নতুন অষ্টিন গাড়ী কিনিয়াছে, ভাইস্‌রয় অমুক চাঁদার খাতা খুলিয়াছেন—আজ আলোকের মনে ইহার এতটুকু আদর পর্য্যন্ত রহিল না। কোথাকার ধূম মলিন একতল একখানি গৃহ, তাহারই মাঝে দীনদুঃখীর দু'টি মলিন শুষ্ক প্রতিচ্ছবি তাহার চোখের পাতায় ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

যে সব কথায় সুরেন রায়ের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছিল, হঠাৎ একসময়ে তাহার মনে হইল আলোক তাহার কিছুই শুনিতেছে না। বলিল—তুমি আবার সেখানে যাবে না কি?

যাব বৈ কি।

সুরেন্দ্র আর কিছুই বলিল না। সে টানা খুলিয়া কতকগুলি কাগজ টানিয়া লইল এবং সিগারেটের ধুমের সঙ্গেই তাহার মন উড়িয়া উড়িয়া কাগজের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল। বাস্তবিক অন্য

কাজে বা কথায় মন দিবার মত প্রচুর অবকাশ তাহার ছিল না। হাইকোর্টের কয়েকজন উকীল ব্যারিষ্টার কাউন্সিলে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইয়াছে—যদিও চেষ্টা-অর্থব্যয়ের কমতি নাই তবুও—সে যথার্থই শঙ্কিত হইয়াছিল। কোন্ উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলে সফলকাম হইতে পারা যায় সুরেন্দ্র নিবিষ্টচিত্তে তাহাই ভাবিতে বসিয়া গেল—আলোক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গাড়ী-খানায় খবর পাঠাইয়া দিল। স্নান সারিয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল—আমি যাচ্ছি।

সুরেন রায় মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল—আমিও বেরুব।

যখন সে কুমুদের ঘরে ঢুকিল, কুমুদ অজয়ের মুখের উপর মুখ রাখিয়া বোধ করি কি বলিতেছিল, তাড়াতাড়ি মুখ তুলিয়া বলিল—এই যে আলোক!

রাত্রে কেমন ছিলেন, দিদি?—নিজে রীতিমত সংবাদ না দিয়া ঘরে ঢুকিয়া সে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছিল, তাই প্রশ্ন করিয়াও সে মাথা তুলিতে পারে নাই।

কুমুদ তাহার হাত ধরিয়া সযত্নে কাছে বসাইয়া বলিল—ভালোই ছিলেন, দুবার ওষুধ খাইয়েছি জ্বর আর আসে নি।

শুনিয়া আলোক হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে কহিল—আর দু'চারদিনেই সেরে উঠ্‌বেন, কি বলেন?— অজয়ের পানে চাহিয়া সে কথা কয়টি বলিয়াছিল, কিন্তু কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অজয় মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে তাহা বুঝিয়াই বলিল—আমার ত তাই মনে হয়।—না-দিদি?

কুমুদ অসংলগ্নভাবে বলিল—ভগবান তোর মুখে······কথাটা সে শেষ

করিতে পারিল না। স্বামী তাহার বিরক্ত হইয়াছেন কি-না সে জানে না। আলোকের আচরণ এমনই সরল উদার আত্মীয়বৎ যে তাহাতে বিরক্ত হওয়া যে কাহারো চলিতে পারে এ'ই যেন তাহার ধারণার অতীত ছিল, কিন্তু এই মাত্র আলোকের কথার উত্তর না দিয়াই যে তিনি মুখ ফিরাইয়াছেন তাহাও ত নিজের চোখেই দেখিয়াছে। ছোট বোন্‌টির অকস্মাৎ শুষ্ক মুখ-চোখও তাহার চোখে পড়িয়াছিল পাছে আলোক ব্যথা পায়, কুমুদ সস্নেহে কহিল—সারারাত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি জন্ম জন্ম যেন তোর মত বোনের দিদি হ'য়েই জন্মাতে পারি আলোক।

আলোক যে বড় একটা কথা কহিতেছে না, সামান্য হুঁ হাঁ দিয়াই সারিতেছে ইহা হইতেই কুমুদের বুঝিতে বাকি রহিল না, ব্যথাটা তাহাকে কতখানি বাজিয়াছে—প্রতীকারের কোন উপায়ই তাহার জ্ঞাত ছিল না, তাই সে নানারকমে নানা কথার ভিতর দিয়া আলোকের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল।

শশী গোয়ালিনী দুধ দিতে আসিয়া রোগীর অবস্থা জানিয়া বলিয়া গেল— ও-ঘরে দুধ রেখে যাই বউ-মা—কুমুদ তাহার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া আলোকের হাত ধরিয়া বলিল—দুধটা গরম করে আনি, আর যাহোক কিছু মুখে দিতে হ'বে ত—রান্নাটাও চড়িয়ে দিই-গে!

আলোক বলিল—আমি যাই দিদি, রান্নাঘরের কাজে, তুমি এইখানে বস। আমার দ্বারা এখানকার কাজ হ'বে না ত!—বলিয়া সে মুহূর্ত্ত-মাত্র প্রতীক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল। কুমুদ বুঝিল, অজয় তাহার সঙ্গে কথা কহিবে না, নিশ্চেষ্ট অলস বসিয়া থাকিবার ভয়েই

আলোক রান্নাঘরের ধোঁয়া-কালির মধ্যে পলায়ন করিল। এক ত মনের মধ্যে যথেষ্ট বিস্ময় সঞ্চিত হইয়াছিল, তার উপর ছোট বোনটির এমন অনাদর তাহার অসহ্য বোধ হইল, সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে স্বামীকে জিজ্ঞাসিল—এতে মানুষ ব্যথা পায় জানো?

অজয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। কথার জবাব দিতে না পারিয়া শুষ্কমুখে চাহিয়া রহিল।

কুমুদ বলিল—সামান্য কি-একটা অপরাধে তুমি যে আমার মার পেটের বোন্‌টিকে এমন অযত্ন করবে তা আমি জান্‌লে কখনই ওকে ডাকতুম না। তা সে আমার বরাতে······বলিতে বলিতে আলোক না-আসিলে, উত্তমরূপ চিকিৎসা না হইলে কি হইত তাহারই যেন একটা বিশ্রী চেহারা দেখিয়া শিহরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অজয় বলিল—আমাকে জিজ্ঞাসা কর-নি কেন কুমু?

ওঃ—তারই সাজা দিচ্ছ! কিন্তু সে ওকে কেন? ও ত কোন অপরাধই করে নি। দিতে হয় আমাকে সাজা দাও, আমি অম্লানমুখে সহ্য করব। ও-ছেলেমানুষ, প্রাণ দিয়ে কতই না করছে, ওকে কেন?

অজয় একমিনিট পরে বলিল—আমার মান-অপমান তুমি কি বুঝ্‌বে কুমু!

কুমুদ বলিতে গেল, সে বুঝিবে না ত কে বুঝিবে কিম্বা এমনধারা একটা কিছু—কিন্তু পারিল না। এতদিনের পর স্বামীর মুখের এতবড় নির্ম্মম অনুযোগ তাহাকে শরবিদ্ধ বিহগের মত করিয়া ফেলিয়াছিল, প্রবল চেষ্টা স্বত্বেও মুখ দিয়া শব্দ উচ্চারিত হইল না।

আলোক রান্নাঘরের হাতা বেড়ী, হাঁড়ী কলসীর মধ্যেই মগ্ন ছিল.

কুমুদ আসিয়া দাঁড়াইতে হাসিমুখেই কহিল—ডাক্তারবাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি দিদি।

আবার ডাক্তারবাড়ী কেন—বোন্?

ও-মা, সে-কি! একদিনেই সেরে গেল বুঝি! কি বুদ্ধি তোমার দিদি!

কুমুদ অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল—একি অসাধারণ ধৈর্য্যশীল সহিষ্ণু বোন্‌টি তাহার! সে কল্পনায় তাহার ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়াই আসিয়াছিল, কি বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করিবে, কি-আদরে স্বামীর হতাদর তাহাকে ভুলাইবে এই ভাবনায় সে ম্লান হইয়া গিয়াছিল, এখন তাহার অনুদ্বিগ্ন হাসিমাখা সেই মুখ দেখিয়া কুমুদের সমস্ত দেহমন জুড়াইয়া গেল।

মধ্যাহ্নে আহারের পর আলোক বাড়ী ফিরিবে কি-না পতিতপাবন সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল, পাশের ঘরে থাকিয়াই কুমুদ কান দু'টি একেবারে দ্বারের বাহিরে যেন আলোকের মুখের কাছে পাতিয়া দিল। যা শুনিল যেমন আশ্চর্য্য, তেমনি চমৎকার!

আপনি দিদিমণিকে (বড় রাণী) বলবেন গিয়ে যে এখানে আমার অনেক কাজ আছে—ফেলে আমি যেতে পারব না। আপনি কিন্তু বলেই ফিরে আস্‌বেন, গাড়ীর দরকার হতে পারে।

কুমুদ বলিল—কাকে বলে পাঠালি আলোক?

বড় রাণী, আমার বড় মা। তিনিই বাড়ীর গিন্নি।

তিনি রাগ করবেন না ত?

কেবলমাত্র একটি 'না' বলিয়াই আলোক থামিতেছিল কি ভাবিয়া মুখটি তুলিয়া কহিল—না দিদি, তাঁরা রাগ করেন না—কিছুতেই না।

কুমুদ সহজ কথাই বলিল—তোকে বুঝি তাঁরা খুব ভালবাসেন। আর সে কথা জিজ্ঞাসাই বা করি কেন—কে না বাসে তোকে!

আলোকের শুষ্ক ঠোঁঠ দু'খানি একবার কাঁপিয়া উঠিল মাত্র, তখনি ক্ষীণ হাসির রেখায় সে ঈষৎ বিস্ফারিত হইল।

কুমুদ প্রসন্ন মনে ও-ঘরে চলিয়া গেল। ইচ্ছা, এতবড় ত্যাগের সংবাদটি তখনি অজয়কে শুনাইয়া দেয় কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, সে নিদ্রামগ্ন। স্বামীর ভুলটি ভাঙ্গিয়া দিবে কিন্তু তাঁহাকে আঘাত না লাগে এমনি একটা সহজ উপায়ে কথাটা তাঁহার গোচর করিবে—এই সব কথাই ভাবিতে লাগিল।

আলোকের শুষ্ক হাসি কুমুদ চিনিতে পারে নাই। নিজের প্রসন্নতাতেই তাহার মন এত পরিপূর্ণ ছিল যে অন্যরূপ কল্পনাও সে করিতে পারিল না। যতই ভাবে, ষোড়শী তরুণীর সুকোমল হৃদয়ালুতায় তাহার অন্তরে পুলকের বন্যা ভাসিয়া যায়—এবং সেই তরুণী যে তাহার ভগ্নী—ইহা ভাবিতে হৃদয় শতবাহু তুলিয়া নৃত্য করে।

—৬—

অজয়কে নিজের হাতে অন্নপথ্য করাইয়া সেইদিন দুইটার সময় আলোক আচম্বিতে কহিয়া উঠিল, চল্লাম দিদি!—অজয় দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রহিল। কুমুদও কিছু বলিবার আগেই আলোক নত হইয়া তাহার পদধূলি তুলিয়া লইল। দুহাতে নমস্কার করিয়া অজয়কে বলিল—দিনকতক দুপুরবেলা শোবেন না, আর আফিসের ছুটি কিছুদিন বাড়িয়ে নেবেন।

আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি কুমুদের ভিতরে কতরকমের কত কথা একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল—সূচীভেদ্য অন্ধকারে ঘোর দুর্দ্দিনে বিপদের সমস্ত বোঝা তুলিয়া লইয়া যে অকাতরে তাহার স্বামীর সেবা করিয়া বিদায় লইতেছে তাহাকে অন্তরের শুভেচ্ছা জানাইতে তাহার উন্মুখ হৃদয়খানিই বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল, কিন্তু নারীর মন—স্বামীকে নীরব দেখিয়া কি যে ভাবিল, কি যে করিল, সে এক অদ্ভুত কাণ্ড!

হঠাৎ দু'হাতে অজয়ের রোগজীর্ণ পাংশু পা'দুটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—একবার, একটিবার মুখের কথাতেও একটা আদর করতে পারলে না! আলোক বলে' না-কর, সুরেনের স্ত্রী বলে' না পার, আমার বোন্, মা হারা ছোট বোন্‌টি বলে একটি কথা ক'য়েও বিদায় দিতে পারলে না তুমি!

কিন্তু এ ব্যথা ত তার নয়, এ যে আমারই মৃত্যুবাণ! ভগবান করুণ, তার গায়ে যেন না বাজে এ!

রোগে ভুগিয়া যে সব স্নায়ু শীর্ণ শিথিল হইয়া গিয়াছিল, তাহারই একটা মাথা তুলিতেই অজয় কর্কশস্বরে ডাকিল—কুমুদ!

কুমুদ তাহার পা ছাড়িয়া দিয়া বলিল—বুঝেছি।—বলিতে বলিতেই তাহার বুক কাঁপিয়া চোখ ভাসিয়া গেল। দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

আলোক মোটরে চড়িয়া বসিয়াও ষ্টার্ট্ দিতে নিষেধ করিল। দিদির অপেক্ষায় সে দ্বারের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল, পাঁচ সাত মিনিটও কাটিয়া গেল, কুমুদ আসিল না। রাস্তার মাঝে এমন একখানা নূতন ঝক্‌ঝকে মোটর বলিয়াই হোক্, যে জন্যই হৌক যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ কাহারো যেন চক্ষে আর পলক রহিল না। দু'চারটি উলঙ্গ শিশু ঝক্‌ঝকে মোটর দেখিতেছিল বটে, কিন্তু শিশুর উপরওয়ালাদের ধারালো চোখের তক্‌তকে দৃষ্টি কোথায় তাহা দেখিয়াই আলোক বিবর্ণ হইয়া গেল, আরক্তমুখে বলিল—চালান।

সুরেন রায় কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—কি খবর?

আলোক কাছটিতে বসিয়া পড়িয়া এক এক করিয়া সব কহিল। শেষ করিয়া জিজ্ঞাসিল—দিদিমনিকে এ তিনদিনই আমি চিঠি লিখেছি, তোমায় দেন নি?

সুরেন রায় কহিল—সেই ত হ'য়েছে গোল, ভূপতি সেনই ভোট বেশী জোগাড় করে ফেলেছে, আমাকে কেউ দেয় নি।

মা গো! আলোকের যেন কান্না আসিতেছিল। সে ঘর ছাড়িয়া

চলিয়া যাইতেছে, সুরেন রায় সস্নেহে বলিল—আচ্ছা তোমার কি মনে হয়? ভূপতি সেন সত্যই হারাবে আমাকে?

কি জানি!

তাহার স্বামী কহিল—বড় সহজে পার্চ্ছেন না বাছাধন। আমিও নরেশ ঘোষকে লাগিয়েছি, লোকভাঙ্গাতে। দেখি কি হয়।

সমস্ত দিন, দেড় প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সুসজ্জিত ঘরের আসবাব খেলনা গুছাইয়া নাড়িয়া তবুও আলোক কাজের অন্বেষণে ছট্‌ফট্ করিয়া মরিতে লাগিল। একসময়ে দুহাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া আপনার মনকে প্রশ্ন করিল—এ তাহার কি হইল? আজ এ ষোড়শবর্ষ পরে কিসের সন্ধানে মন তাহার এমন বিমর্ষ হইয়া গেল? কিসের নূতন আকাঙ্ক্ষায়, নবীন প্রেরণায় সমস্ত দেহমন একত্র হইয়া তড়িতের মত চঞ্চল অধীর হইয়া উঠিতেছে?

সুরেনের কাগজপত্র টানিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিল, সে বেচারা হাসিমুখে সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া বলিল—আর দশমিনিট—এখনি উঠছি।

সে ত জানিত না, দশমিনিট কাহারো কাছে কোন সময়ে দশঘণ্টা প্রতীত হইতে পারে, সে কাগজে মন দিল, আলোক আর তাহাকে জাগাইল না, বিছানায় শুইয়া আবার সেই প্রশ্নই করিল, যাহার উত্তর সারাদিন, আকাশ পাতাল, মেঘ নক্ষত্র, দিবারাত্র সব খুঁজিয়া কোথাও পায় নাই। প্রশ্ন যে অত্যন্ত অস্বাভাবিক অসম্ভব তাহা সে নিজেই বুঝিয়াছিল তবু যে কেন তাহার মন উত্তর আশা করিয়া তিলে তিলে দগ্ধ হইতেছিল তাহা সে জানে না!

সহরের চাকচিক্য যত মোহময় উজ্জ্বল হোক, বাঙ্গালার পল্লীর স্নিগ্ধ শ্যামলতায় যেমন চক্ষু জুড়াইয়া যায়,—ধাঁধা-লাগা আলোর তফাতে অন্ধকারে আসিয়া মানুষ যেমন অনেক সময়ে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে, আলোকেরও তেমনি একটা বিগত অনুভূতির নিঃশ্বাস সুযোগ পাইয়া কেবলই বুকের মধ্যে ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, অথচ সে যে কি, কিসে তাহার উৎপত্তি এবং কি করিলে তাহার নিবৃত্তি হইবে এমনি নানান্ চিন্তার মধ্যেই সে সুরেন রায়ের স্নেহের পাশ হইতে আপনাকে ছিন্ন করিয়া শয্যার শেষ প্রান্তে যেন একটা অচেনা যায়গায় আত্মগোপন করিল।

কাউন্সিল, ভোট, ভুপতি সেন এই করিয়া সুরেনের মস্তিষ্ক ক্লান্তই ছিল, নিজের খাটে শুইয়া পড়িতেই নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইল। এবং সেই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই আলোকের বুক যেন বাজের শব্দে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কতবার ভাবিল যে-হাত দু'টি ফিরাইয়া দিয়াছে নিজে গিয়া সে দু'টি কণ্ঠে ধরিয়া লয়, কিন্তু একি অবসন্নতা তাহাকে ঘিরিয়াছিল, না পারিল উঠিতে, না পারিল একটা মৃদু আহ্বানে তাহাকে জাগাইতে! অত্যল্প ক্ষুদ্র শব্দেই স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হয়—এ অভিজ্ঞতা তাহার ছিল, তবু একটু খানি শব্দ করিতেও পারিল না। আড়ষ্ট অলসের মত পড়িয়া আবার সেই আকাশ পাতালেরই অন্বেষণ করিতে লাগিল।

এ হয়ত সকলে বুঝিবে না। নব যৌবনাগমে ষোড়শী তরুণীর এ যে কি হইল, অনেকেই তাহা বুঝিবে না। কেবলমাত্র তাহারাই বুঝিবে, নিরবচ্ছিন্ন সুখ যাহারা একটি দিনের জন্যও অনুভব করিয়াছে।

নিজের স্বার্থসমৃদ্ধ সংসারের বাহিরে, আপন আপন আত্মীয়পরিজন ছাড়া এই বিপুল বিশ্বের জনমানবের সহিত যাঁহার কোন সংস্রব নাই তাঁহাকে এ কথা বুঝাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা যে কে-পর, কোথায়-দেখা কাহার সেবায় আপনার দেহ মন নিয়োজিত করিতে মানুষের হৃদয় এমন করিয়া, সব হারাইয়া, সকল ফেলিয়া, উন্মুখ হইয়া থাকিতে পারে! সমস্ত সুখ, সমস্ত শান্তি যে সেইখানেই মিলিয়া মিশিয়া অনন্ত অবিরাম হইয়া বিরাজ করিতে পারে এ কেবল তিনিই বুঝিবেন, পরের জন্য একটি নিমিষের তরেও যাঁহার এক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়াছে! পরকে সুখী করিতে নিজের সুখ এক অনুপলের জন্যও যিনি উপেক্ষা করিতে পারিয়াছেন!

আলোক সেই পারাই পারিয়াছিল। কেমন করিয়া পারিয়াছিল, কে তাহাকে শিখাইয়াছিল জানি না—কিন্তু পারিয়াছিল। এবং সেই পারার সুখ, তাহার তৃপ্তি হৃদয়ের দিগ্বিদিক এমনি জমাট, ভরাট করিয়া দিয়াছিল যে পৃথিবীর আর কোন উপাদানে। আর কোন কাজেই সে নিজের মনের সাড়া পাইল না। যেন সব ফুল ফুটিয়া, সৌরভ বিলাইয়া ঝড়ে সব কোথায় উড়িয়া গেছে, কেবলমাত্র অবশেষ বৃন্তগুলি গাছের শাখায় মনের পাতায় বিগত জীবনেতিহাসের শুষ্ক সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন, যৌবনোচিত অভাব আলোকের কি ছিল? ধনৈশ্বর্য্য মোটর গাড়ী, লাট বেলাটের সভার সংবাদ তাহার ত কিছুরই অভাব ছিল না, তবে?—তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি না। তবে আলোকের মুখের একদিনের একটি কথা উল্লেখ করিতে পারি—তাঁহারা সন্তুষ্ট হ'ন, মঙ্গল, নতুবা নাচার।

"দিদি অমন করে কেউ কোনদিন আমাকে ডাকেও নি—এমন করে কারু কাছে ধরা দিতেও পারি নি। আমরা দু'টি বোন্ যেন সেই রূপকথার রাজকন্তের মত দু'ঘরে ঘুমিয়ে ছিলুম, কে যেন ভাই সোনার কাঠি রুপোর কাঠিতে জাগিয়ে আমাদের মিলিয়ে দিল, নয়?"

এ কথা সে একদিন কুমুদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, তখন কুমুদের স্বামী অজয় শয্যাগত; কুমুদ সাতিশয় জীর্ণ শীর্ণ, কঙ্কালসার।

—৭—

ফিরিয়া আসিয়া তিনচারদিন আলোক কোন সংবাদই লইতে পারিল না। কেন পারিল না, তাহার কোন উত্তরই নাই। লোকবল তাহার অল্প ছিল না, সাবকাশের অভাবে কোন দিনই তাহার কোন কার্য্য পণ্ড হইত না,—তবুও কেন যে সে সে'কদিন কোন খবর লইল না, আমরা তাহার কি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি!

কিন্তু চারদিনের দিন মধ্যাহ্নে পতিত যখন আহার করিয়া বাহিরে যাইতেছিল, নন্দুকে দিয়া তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া বলিল—একবার ঈশ্বর সেনের গলিতে যান ত! গাড়ী নিয়েই যান, চট্ করে ফিরে আস্‌বেন।

যে আজ্ঞে—বলিয়া পতিত অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ছোটরাণী বলিলেন—দাঁড়িয়ে কেন……যান।

পতিত বলিল একটা চিঠি……

কোন দরকার নেই। আপনি অমনিই যান্। বলিয়া ছোটরাণী কক্ষাভ্যন্তরে চলিয়া গেল। পতিত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেল। বেচারা তখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না কি কার্য্য সাধন করিয়া আসিতে হইবে। এমন সাহসও হইল না যে আর একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লয়।

আধঘণ্টাটাক পরে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই আলোক জিজ্ঞাসিল—ভালো আছেন সব ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ভালোই আছেন। জানেলা খুলে বাবু নিজেই জবাব দিলেন।

আলোক পুলকিতকণ্ঠে কহিল—তিনি উঠতে পেরেছেন ? আমার দিদিকে দেখ্‌তে পেলেন না ?

আজ্ঞে না—তাঁকে ত দেখ্‌লুম না।

খাওয়া দাওয়া করছিলেন বোধ করি—বিজড়িতস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে আলোক চলিয়া গেল। তখনি ফিরিয়া পতিতের নিকটে আসিয়া বলিল—দেখুন, আপনি এমনি গিয়ে খবরটা নিয়ে আস্‌বেন। বুঝলেন ?

পতিত জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, রোজ যাইবে কি-না—কিন্তু তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। আলোক তখন অনেক দূরে সরিয়া গেছে। কাজে কাজেই সে রোজই মধ্যাহ্নে দু'চারটি কথায় সে বাড়ীর সংবাদটি কর্ত্রীর গোচর করিয়া যায়।

আলোক নিজে কোন প্রশ্ন করে না ; পতিত যাহা বলে কেবলমাত্র সেইটুকু শুনিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।

শেষে এমন হইল ঠিক সেই সময়টিতে ছোটরাণী সব কাজ ফেলিয়া নিজের ঘরের দ্বারটির কাছে একটা চৌকী টানিয়া বসিয়া থাকিত। কতক্ষণে বিন্দু আসিয়া মোটর বাবুর আগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করে তাহারই প্রতীক্ষা করা যেন একটা অতি অবশ্য কর্ম্মের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কতদিন সে ভাবিয়াছে, এটা ঠিক ন্যায়মত হইতেছে না! মার পেটের বোন্—তাহার সংবাদ লইতে একজন পরকে পাঠানো অন্যায়, নিজের যাওয়াই উচিৎ কিন্তু সে সাহস তাহার ছিল না। যে সাহসে কিছুদিন পূর্ব্বে সে গৃহস্বামীর বিরক্তি অবহেলা অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া গেছে এবং আসিয়াছে সে সাহস আর আলোকের নাই। তখন কর্ত্তব্যের আহ্বান ছিল এখন আর তাহা নাই—কাজেই সাহস নাই।

একদিন পণ্ডিত আসিয়া বলিল মা, ওঁদের বোধ করি বড় কষ্ট হ'য়েছে। আজ খিড়কীর দরজাটা খোলা ছিল, দেখি যে মা'ঠাকরুণ নিজেই বসে বাসন মাজছেন।

আলোক নতমুখে জিজ্ঞাসিল—কিছু বল্লেন?

না। কেবল বল্লেন বাবু ভালোই আছেন।

আলোক একটুখানি কি ভাবিল, তারপর বলিল—আপনার এখন কি কোন কাজ আছে?

না। বাবু ত রোজ বড় গাড়ীতেই বেরোন,—আমার আর কি কাজ!

আলোক বলিল—তবে এক কাজ করুন। আপনি বাইরে বসুন গে, আমি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি নিয়ে আর একবার যাবেন। বুঝলেন? আর একটা জবাবও আনবেন।

যে আজ্ঞে—বলিয়া পণ্ডিত বাহিরে চলিয়া গেল। আলোক পত্র লিখিতে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, কি লিখিবে? কুমুদ নিজের ঘরে বাসন মাজিতেছে,—এত কত গৃহস্থবধূ মাজিয়া থাকে, সে কথায় অনুযোগ করা ত চলিতে পারে না। কুমুদ যদিও না হয়, অজয় জানিলে

অসন্তুষ্ট হইবে এবং সে কথা লিখিবার অধিকার কেহ তাহাকে দেয় নাই।

পত্র রচনা করিতে বসিয়া আলোকের সেই সব কথাই মনে পড়িয়া গেল, অজয়ের অসুখের সময়ই সে যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল। অর্থাভাবে চিকিৎসা পথ্য সব বন্ধ হইতে বসিয়াছিল কেবল আলোক যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারায় সব দিক রক্ষা পাইয়াছে। তদবধি অজয় আফিসে যাইতে পারে নাই,—যে খোট্টা ঝিটি ছিল, বিনা বেতনে কাজ করিয়া যাইবার মত ঔদার্য্য তাহার ছিল না, এতদিনে সেই গোয়ালিনী-ও হয়ত দুধের জোগান বন্ধ করিয়াছে, ডাক্তারখানায় আলমারিতে 'টারমস্ ক্যাস' (নগদ দাম!) লেখা, ঔষধ ত নিশ্চয়ই বন্ধ; মুদীর দোকান, নগদ বাজার অর্থহীনের সামনে সকলের কপাট রুদ্ধ! ধারে মাল সরবরাহ করিতে হইলে দোকানের ঝাঁপ টানিতে হইবে বলিয়া কয়লাওলা বেশ চোখা চোখা কথা শুনাইয়া গেছে এমন আরও কত কি?—ভাবিতে ভাবিতে আলোকের চোখের সামনের দিনের আলোক ম্লানধূসর হইয়া গেল। আঙ্গুল শক্তিহীন, লেখনী খসিয়া পড়িল। অশ্রু বিগলিত চোখের পাতায় সেই মলিন গৃহাভ্যন্তরের ভয়াবহ চিত্র যেন একটি একটি করিয়া কাঁটার মত ফুটিয়া তাহাকে বেদনাতুর করিয়া ফেলিতেছিল।

বিন্দু দরজার বাহির হইতে কহিল- ছোট মা মোটর বাবু বল্‌ছে—তিনটার সময় কোন্ সাহেবকে আন্তে গাড়ী যাবে—তোমার চিঠি যদি হ'য়ে থাকে—শুনিয়াই আলোক মুখ চোখ মুছিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। লোহার আলমারিটা খুলিয়া একখানা একশত টাকার নোট্ বাহির

করিয়া খামে মুড়িয়া বলিল—এইটে পতিত বাবুকে দিগে যা বিন্দু—সে খামখানা ছুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। নিজের পরিচারিকার সামনে অকারণে চোখের জলের রেখা দেখাইতে তাহার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল।

ঘণ্টাখানেক পরে বিন্দু বলিয়া গেল—মোটর বাবু ফিরে এসেছে, চিঠির জবাব পায়নি বলে গেছে।

আলোক নিজেই জানিত যে জবাব আসিবার কিছুই নাই তবুও যেন তাহার মন বলিতেছিল একটি ছত্র—অন্ততঃ প্রাপ্তি স্বীকার পত্রও আসিতে পারে! বিন্দুর কথায় কতকটা আরাম অনুভব করিলেও কিসের জন্য তাহার মন যেন একটু ক্ষুণ্ণও হইয়া গেল। বিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল পতিত মোটর লইয়া কোন্ সাহেবকে আনিতে গিয়াছে—বিন্দুর মারফৎ দ্বারবানকে বলিয়া পাঠাইল, গাড়ী ফিরিলে পতিত যেন অন্তঃপুরে আসিয়া ছোটরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যায়।

মথুরা খানসামার ছেলের অসুখ. বেয়ারিঙ চিঠির পর চিঠি আসিতেছিল, আজ জরুরী টেলিগ্রাম আসিয়াছে—অর্থাভাবে চিকিৎসা হইতেছে না, ছেলেটির বাঁচিবার আশা নাই। মথুরা লাল-ফরমখানি লইয়া বড়-রাণীর কাছে দরবার করিতেছিল, সরকার মহাশয় তাহার হিসাব করিবে না বলিয়াছে, বাবুর হুকুম নাই; ছুটিও দিবেন না—ছোটবাবু পশ্চিম যাইবেন, তাঁহার অসুবিধা হইবে বলিয়া!—মথুরা দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছিল, আলোক সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে তাহা দেখিতে পাইয়া-নিকটে আসিতেই বিন্দু ঝি বিনাইয়া বিনাইয়া সব কথা বলিল। মথুরা ছোটরাণীর কাছে যায় নাই, ছোটরাণী সংসারের কোন কথাতেই থাকিত

না। তাই ছোটরাণীকে কাছে পাইয়াও কিছু বলিল না। কেবলমাত্র বড়রাণীর পা জড়াইয়া বলিল—রাণী মা, গতর খাটিয়েছি, পয়সা পাব, আর বিপদের সময় তাও যদি না পাব ত চাকরী করা কিসের জন্যে।

বড়রাণী বলিতেছিলেন তুই ছোটবাবুকে বললিনে কেন?

মথুরা কাঁদিয়া বলিল—বলেছি মা। গরীব নোকের ছেলের অসুখ কি বড় নোকে বোঝে মা! বড় বাবুকে বল্লুন, বড় বাবু তাড়া দিলে, ছোট বাবুকে বল্লুন, ছোট বাবু সরকারকে ডেকে মানা করলে।

আলোক দৃপ্তকণ্ঠে কহিল—কোন সরকার? বিন্দু, তাঁকে ডেকে আন ত! না থাক্—আমার নাম করে বল্‌গে যা, এখনি মথুরার হিসেব করে' টাকা মিটিয়ে দিতে। আর খাতায় ওর একমাস ছুটি লিখে নিক্। বলে আয়, বাবু কিছু বলেন, সরকার যেন আমার নাম করে!

এতবড় কথা বড়রাণীও বোধ করি বলিতে পারিতেন না। ঘরশুদ্ধ লোক স্তব্ধবিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল।

মথুরা অশ্রুসিক্ত চোখে গদগদ কণ্ঠে কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেছিল, আলোক বিন্দুকে ধমক দিয়া বলিল—হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইলি কেন বিন্দু? কথাটা কানেই গেল না!

বিন্দু থতমত খাইয়া 'যাই মা' বলিয়া নামিয়া গেল। 'যা মথুরা, হিসেব মিটিয়ে, যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যাস্—বলিয়া কৃতজ্ঞতাসূচক কোন কথা শুনিবার আগেই বড়রাণীর দিকে ফিরিয়া বলিল—এই ভেবে আশ্চর্য্য হই আমি দিদি, যে বড় লোকে কেবল

পয়সারই পরিচয় দিতে পারে, মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দেবার ইচ্ছেও তা'দের থাকে না, হৃদয়ও থাকে না—আশ্চর্য্য !

কোন কথা শুনিবার আগেই আলোক তথা হইতে প্রস্থান করিল। বড়রাণী বোধ করি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। আলোকের কথার ঝাঁজটা যেন তাঁহার স্বামীকেও স্পর্শ করিয়াছিল। এবং ইহাই কল্পনা করিয়া নিকটাত্মীয় একটি বর্ষিয়সী মহিলা তাঁহার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া যখন সহানুভূতির স্বরে বলিলেন—বড় লোক—বড় লোকই হয়। বড় লোক আর কবে ছোটলোক হ'য়ে থাকে। 'ও সব কথায় কান দিতে গেলে চাকর বাকরদের আস্কারা দিলে কি আর সংসার চলে--তখন কিন্তু বড়রাণীর শুষ্কমুখেই হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—না মাসীমা, আলোক ঠিকই বলেছে, আমরা নিজের সুখ-দুঃখই এত বড় করে দেখি যে পরের সুখদুঃখ নজরে পড়বার সুযোগ আমাদের থাকে না।

মাসীমা কথাটার যে অর্থ করিলেন তাহা প্রকাশ পাইল এইরূপে যে সকলের ছোট হইয়া আলোকের সবার উপর 'কর্ত্তার্ত্তি' করা অত্যন্ত অশোভন এবং ভাগাবশে বড়রাণীর মত 'মা' পাইয়াই এ যাত্রা সে তরিয়া গেল।

নিজের প্রশংসাতেই বোধ করি বড়রাণী ঈষৎ হাসিলেন এই ভাবিয়া মাসীমা "হ্যাঁ মা, আমি যা বলব, কারু ভয়েও বলব না, মুখ চেয়েও বলব না" বলিয়া নিজের সত্য ও স্পষ্টবাদীতার গর্ব্বে প্রফুল্ল হইয়া প্রাচীরের উপরে উপবিষ্ট শব্দ-নিরত বায়সটিকে তাড়া করিতে উদ্যত হইলেন।

সন্ধ্যাকালে পতিত আসিতেই আলোক জিজ্ঞাসুমুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। পতিত প্রশ্নের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল, আলোক বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসিল—চিঠি দিয়েছিলেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা আমায় বলে যান নি কেন ? হ্যাঁ হ্যাঁ নিজে এসে বলে যেতে পারেন নি ? কোন কথা বলেছেন দিদি ?

না। তবে……

পতিতকে ইতঃস্তত করিতে দেখিয়া আলোক রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল কি বলছিলেন, বলুন না।

আর যেতে মানা করে' দিয়েছেন।

কে ?—জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াও আলোক পারিল না। দিদি বারণ করিয়াছেন—বিশ্বাস হয় না, তবে কে ? অজয় বাবুই নিশ্চয় !—তবুও লোকটি কে - জানিবার জন্য সে ছট্‌ফট্ করিতেছিল, কিন্তু হায় ! যে এ সংবাদ বহিয়া আনিয়াছে; সে ভৃত্য মাত্র। তাহাকে আর প্রশ্ন করাও চলে না—তর্জ্জনীসঞ্চালন করিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হুকুম দিয়া আলোক ঘরে ঢুকিতে যাইবে, মথুরা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই অসম্ভব রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠে তাহাকে দূর করিয়া দিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

মথুরা 'তবে আর যাওয়া হল না মা'—বলিয়া কাঁদিয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িল।

আলোক দরজা খুলিয়া একখানা পঞ্চাশটাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল—চিকিৎসা করাস। ছেলে কেমন থাকে আমাকে

চিঠি লিখিস্ মথুরা! আর সেরে গেলেই চলে আস্‌বি দেরী করিস নি।

না মা, দেরী করব না!—বলিয়া দু'হাত বাড়াইয়া পদধূলি তুলিয়া লইতেই আলোক স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে বলিল—আশীর্ব্বাদ করি, তোর ছেলে সেরে উঠুক।

মথুরা আবার নত হইয়া প্রণাম করিল।

—৮—

মাস দেড়েক পরের কথা!

মুণ্ডিত মস্তক গায়ে একখানা বোম্বাই চাদর, খালি পা একটি লোক একখানা বড় বাড়ীর দেউড়ীতে জমাদারের জবাবদিহি করিতেছিল, ষোল সতেরো বছরের একটি হিন্দুস্থানী বালক নিকটে আসিয়া আধা বাঙ্গালায় বলিল—বাবুজী আইয়ে, ছোট রাণীমা ডাক্‌ছেন।

জমাদার দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসিল—ইস্‌কো?

বালক উঞ্চ হইয়া কহিল—হাঁ হাঁ রাণীজী তুম্‌সে বহুৎ গোঁস্সা হুয়া। আইয়ে·····

অজয় বালকের সঙ্গে যে ঘরে প্রবেশ করিল, আলোক সেইখানেই একটা চেয়ারের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

উপরের বারান্দা হইতে সে কেবলমাত্র অজয়কে চিনিতে পারিয়াছিল। তাহাকে এ বাড়ীতে দেখিয়া আনন্দের পরিমান যতই হোক, সাম্‌নে দেখিয়া সে একেবারে যেন কি রকম হইয়া গেল।

তাহারই হস্তধৃত কেদারাখানা ঈষৎ টানিয়া অজয় বসিয়া পড়িয়া বলিল—তোমাকে একটি খবর দিতে এসেছি আলোক।—সে চুপ করিল। বক্তার ভগ্নস্বরে আলোক একটি প্রশ্নও করিতে পারিল না।

অজয় কোন্‌দিকে চাহিয়াছিল বলা যায় না, আলোক তাহারই মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

অজয় ঐ কথাটিই পুনরাবৃত্ত করিল। এবার কণ্ঠস্বর আরো ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিয়াছিল।

যে লোক জীবনে এই প্রথম এ বাড়ীতে পা দিয়াছে, একটি কথা বলিতেই যে তাহার আগমন অথচ বলিতে সে ক্রমাগত ইতঃস্তত করিতেছে দেখিয়া আলোকের মনে পড়িয়া গেল, অজয়ের রোগশয্যায় শুইয়াও নির্লিপ্ত আচরণটি। সে মিনতিপূর্ণস্বরে কহিল—বলুন না অজয় বাবু, আমার কাছে বল্‌তে আপনার বাধাই বা কিসের!

হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া অজয় বলিল—নাঃ, বাধা আর কি—কিছু না।

মুখে সে 'কিছু না' বলিল বটে, কিন্তু কথাটা কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারিল না।

আলোকের নিজের স্বভাবটিও ছিল এই রকমের যে কাহারো কাছে যাচ্ঞা করিতে মুখে রক্ত উঠিয়া পড়িত, অথচ প্রার্থনা তাহার ব্যক্ত হইত না। অজয়ের মনোভাবটি সে সহজেই বুঝিল। কেদারার হাতার উপর হইতে অজয়ের হাতখানি তুলিয়া লইয়া বলিল—দিদি কিছু বলে পাঠিয়েছেন?

আলোক, কুমুদ নেই!

নেই—বলিয়া আলোক ভূতলে বসিয়া পড়িল। কি হইল তাহার জানি না, সে কাঁদিল না, এতটুকু বিলাপও শুনা গেল না—নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ কম্পিত সজলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আমাকে খবর দেন নি কেন ?

অজয় ধীরস্বরে কহিল—তার নিষেধ ছিল।

মিথ্যে কথা !—বলিয়াই সে দু'হাতে মুখ ঢাকিল।

অজয় বলিল—কুমুদ বলেছিল, তার মৃত্যুর পর তোমাকে খবর দিতে। এ কথা মিথ্যে নয়, স্বর্গ থেকে সে নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছে।

আলোক পুনরায় জিজ্ঞাসিল—এই কথা দিদি বলেছিলেন ?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন ? কি অপরাধ করেছিলুম আমি, অজয় বাবু, যে আমার মার পেটের বোনকে সেবা করা দূরে থাক, চোখের দেখা—শেষ দেখাটা পর্য্যন্ত করতে দিলেন না ?—অশ্রু তাহার বাক্‌রোধ করিল। বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন আচ্ছাদন করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। অবশেষে বলিল—বলতে পারেন কোন্ পাপের সাজা আপনি অমন নির্ম্মম হ'য়ে আমাকে দিচ্ছেন ?

অজয় বলিল—সাজা দিচ্ছি তোমাকে আমি, আলোক ?

আলোক তীক্ষ্ণ সজল চোখে চাহিয়া কহিল—যাক্ সে—আপনার কাজ আপনি করেছেন !

অজয় সোজা হইয়া বলিল—আলোক, সে তোমার বোন্, আমার কি কেউ ছিল না সে !

হঠাৎ আলোক যেন উজ্জ্বল আলোকে লোকটার সম্পূর্ণ চেহারা দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অত বড় অসুখের পরও সে তাহাকে দেখিয়াছিল, এমন বিবর্ণ কৃশ পাণ্ডুর ত দেখে নাই ! আজিকার এ চেহারা

যেন মরণোন্মুখের মত পাংশু বোধ হইল। সঙ্গে সঙ্গেই অতীত দিনের কত কথাই না মনে পড়িয়া গেল!

কথা সে এমন কিছুই নয়। অত্যন্ত সাধারণ ও একান্তই স্বাভাবিক। রোগ শয্যার পার্শ্বে বসিয়াই কুমুদ দারিদ্র্যের সুখ দুঃখ বিজড়িত দাম্পত্যজীবনের এমন সহজ প্রাঞ্জল 'উপাখ্যান' বলিয়া যাইত—যাহা কোনদিনই আলোক জীবনে বা স্বপ্নে দেখে নাই—শুনে নাই। আলোক ত জানে কুমুদ অজয়ের কি ছিল এবং তাহার অভাবে কতখানি সে হারাইয়াছে। মনে হইতেই বিদ্যুৎশিখার মত তাহার অন্তঃকরণ চনমন করিয়া উঠিল। কোথাকার এক নিদারুণ বেদনা তাহার বুকের পাশ দিয়া গলা পর্য্যন্ত উদ্বেল করিয়া তুলিল।

অজয় দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—চল্লুম আলোক।

সে কথা আলোক শুনিতে পায় নাই, সামনের আর্শীটায় শীর্ণকায় জীর্ণ যে লোক টির সম্পূর্ণ ছায়া পড়িয়াছিল, মৃতের মত পাংশু রক্তহীন মুখ দেখিয়া তাহার কান মাথা এককালে ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল। একবার আর্শীর পানে, একবার জীবন্ত মৃতকল্প লোকটীর পানে চাহিয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও স্পষ্ট কণ্ঠে অজয় বলিল—চল্লুম, আলোক।

আলোক তীরের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া, সামনে আসিয়া বলিল—কোথায় যাবেন বলুন আগে, তবে ছাড়ব।

অজয় ক্ষীণ হাসিয়া কহিল—বাড়ী যাব।

আর সেখানে কেন? কি আছে আর সেখানে?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার মতই অজয় উত্তর দিল কি আছে—কি জানি।

আলোক বুঝিল, কহিল—আর ত কিছু নেই সেখানে। আর আমি আপনাকে যেতে দেব না, এখানেই থাকুন আপনি। না, না, সে কিছুতেই হ'বে না। আপনার যে আর কেউ নেই অজয় বাবু! —সে কাঁদিয়া ফেলিল।

যতক্ষণ সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, অজয় অপলকনেত্রে তাহারই ঈষন্নোত দেহের পানে চাহিয়াছিল!

একটু পরে বলিল—সত্যি আলোক আর আমার কেউ নেই। এক কুমুদ আমার সব হয়েছিল। আর সে বিহনে—কথাটা শেষ হইল না, চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল, কণ্ঠ যেন তাড়া খাইয়া থামিয়া গেল, কথার সুর স্রোতে ভাসিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল। আলোক স্ত্রীলোক, তাহার কাতরতা দেখিলে অধৈর্য্য হইয়া পড়িবে অজয় তাহা জানিত, তবু কুমুদের অভাব তাহার চিত্ত বিশৃঙ্খল করিয়া দিয়াছিল। তখন সে চোখের জল গোপন করিতে করিতে বলিল—কেঁদ না, আলোক ওঠ। বলিয়া কম্পিতহস্তে আলোকের হাত দুটি টানিয়া মুখ খানি তুলিয়া দিল।

কে একজন লোক ঠিক এই সময়ে ঘরে পা বাড়াইয়াছিল, আলোক দেখিতে পায় নাই, অজয় দেখিয়াছিল আলোকের হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল—চোখ মুছে ফেল। দেখ-দেখি কে তোমাকে খুঁজছেন।

কে?—বলিয়া আলোক তীর্য্যকগতিতে অগ্রসর হইল, তখনি ফিরিয়া বলিল—তা দেখ্‌ছি কিন্তু দু'টি পায়ে পড়ি আপনার, একটু বসুন।

অজয় দ্বিরুক্তি না করিয়া বসিয়া পড়িল।

- ৯ -

বড় রাণীর কোলের মেয়েটিকে নন্দরাণী সিঁড়ির উপরে বসিয়া 'গাড়া বে'র প্রলোভন দেখাইয়া দুগ্ধ পান করাইতেছিল, আলোক তাহাকে জিজ্ঞাসিল—তুই আমাকে খুঁজছিলি নন্দ ?

খোকার দুগ্ধ পানে অত্যন্ত অনিচ্ছা—আত্মরক্ষার্থে নন্দরাণীর কোল বিপর্য্যস্ত করিয়া 'পাকীমা'র দিকে হাত বাড়াইল। নন্দরাণী দুধের গ্লাশটা নামাইয়া বলিল—ছোট বাবু ঐ দিক থেকে এসে ঘরে ঢুক্‌লেন।

আলোক শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুরেন্দ্র ঘড়িতে দম দিতেছে। সে গম্ভীরভাবে বলিল—হ্যাঁ ছিল একটু দরকার তা হ'য়ে গেছে।

আলোক তেমনি গম্ভীরভাবে কহিল—তা হ'লে আমি যেতে পারি. দরকার কিছু নেই ত ?

না—বলিয়া সুরেন রায় উল্টাদিকে ঘড়িটার দম লাগাইতে লাগিল।

ইহাও অল্প বিস্ময় নয় ! ছ'বছরের অভিজ্ঞতায় নবীনা রমণী জানিত, তাহার স্বামীর স্বভাবটি কেমন কিন্তু একাথাটিও স্বীকার করিতে সে বাধ্য যে স্বামীর ঔদাসীন্য কেবলমাত্রই ঔদাসীন্য ছাড়া আর কিছুই নয়। পুকুরের

পচাপাঁকের মতই চিরশীতল পদার্থও যে রৌদ্রতাপে পাষাণের মত উত্তপ্ত হইতে পারে এ কল্পনা করাও অস্বাভাবিক বলিয়াই কোনদিন আলোক একথাটি ভাবে নাই যে সে পুরুষ! যে সে রাগ করিতে পারে বা রাগ তাহার শরীরে আছে। সে ত চিরদিনই নির্লিপ্ত উদাসীন; ছ' বছরের মধ্যে আলোক অন্যথা দেখে নাই! কিন্তু রমণী সে, তাহার জানা উচিৎ ছিল যে, স্ত্রী-ত্বে যাহাদের ঔদাসীন্য আছে, ঠিক সেই পুরুষই নারীত্বের সামনে চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। পুরুষের পুরুষত্ব এই খানেই চিরদিন সমান উজ্জ্বল, দেদীপ্য।

তিন চার মিনিট ধরিয়া ঘড়ির দমই চলিতে লাগিল, আলোক হাসি চাপিতে না পারিয়া উচ্ছল কণ্ঠে কহিল—দেখ সোজা দিকটায় তা বলে অত পাক দিও না যেন। তা হলেই শেষ।

না- বলিয়া সুরেন ঘড়িটা রাখিয়া শ্যাময়-চামড়ায় বগলোসটি মুছিতে লাগিল। অকস্মাৎ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসিল—তোমার দিদি মারা গেছেন, না?

আলোকের মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল সে বিষণ্ণস্বরে বলিল—শুনেছ তুমি! কি হয়েছিল শুনলে?

শুনবার লোক ত তোমার কাছে ছিলেন।

তখনি পুনশ্চ কহিল—ভগ্নিপতিটিও চমৎকার বলতে হ'বে বৈ-কি, দুদিন আগে থেকে খবর দিয়ে চিকিৎসাটাও করান দরকার বিবেচনা করেন নি! বলিহারী।

আলোক ব্যথাক্ষুব্ধ মুখে বলিল—আচ্ছা কেন বল দিকিন এ রকম। আজ ঠিক মনে হ'চ্ছে কেন ওঁর অসুখের সময় কোনদিন একটি

কথাও কননি। ভেতরে একটা কিছু আছে, তোমার কি মনে হয়, হ্যাঁগা······

মনে কিছু হয় না, আমি জানি।

আলোক উৎকর্ণ হইয়া রহিল, কিন্তু শব্দ আসিল না। তারপর ব্যগ্রস্বরে বলিল—সত্যি জান?—সত্যই সে যেন এই রকমের কিছু আশা করিয়াই বসিয়াছিল। এই রহস্যের মীমাংসা বুঝিয়া পড়িয়া লইতে সে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিল। দিদিকে জীবনে আর এক তিলও ফিরিয়া পাইবে না, তবু কেন যে সে একটিবারের তরে সেই দু'টি দিনের দেখা সহোদরাকে দেখিয়া গেল না, ইচ্ছামাত্রও প্রকাশ করিল না, এ যেন দুর্ব্বোধ্যই হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সুরেন কথা বলিল না। বগলোস্ রাখিয়া আবার ঘড়িটা তুলিয়া লইল।

আলোক বলিল—সত্যি জান, বল না, ওগো, বল না।

সুরেন গম্ভীরস্বরে বলিল—এতে বলবার কিছু নেই। জানা কথাই—কে না জানে। আসলে-আমাদের সঙ্গে ওদের মিল হয় না।

অর্থাৎ?

সুরেন মুখটা ফিরাইয়া মুহূর্ত্তের জন্য আলোককে দেখিল, তারপর বলিল—বড় লোক গরীবের পার্থক্য মানুষের সৃষ্টি নয়,—উপরকার।

আলোক ত জানে, 'বড়লোক', যাহা বলিতে বড়লোক বুঝায় সে সকল সামগ্রী তাঁহার প্রচুর পরিমাণেই আছে, তবুও তাঁহার কথাটা এমন নির্দ্দয়ের মত শুনিবে এ যেন তাহার জ্ঞানের অগোচর ছিল, দু'তিন মিনিট বিহ্বলের মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল—আত্মীয়দের মধ্যে-ও?

সুরেন রায় তেমনি স্বরে কহিল—তাদের মধ্যেই বেশী—বলিয়া মুখ তুলিয়া পরিহাস করিয়া বলিল—এ তুমি জান্তে না, না জান-না ?

আলোক ছেলেমানষির স্বরে জবাব দিল—না। আমি ত তাদেরই আমার একান্ত আপনার দেখি, যাদের পয়সা হিসাবে দাম অত্যন্তই কম। কি জানি, সকলের মন ত আর একরকম হ'তে পারে না। হয় ত আমারই ভুল। নিজের ভুল স্বীকার কর্ত্তে লজ্জা থাকলেও দোষ নেই।—কথাটার সঙ্গেই আপনাকে যেন ঝাড়িয়া মুক্ত করিয়া নিরপরাধীর মত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

সুরেন রায় চেয়ারখানায় বসিয়া ধীরে ধীরে বলিল—থাকৃগে। আমি তোমাকে খুঁজছিলুম বল্‌তে যে আমি দু'এক দিনের মধ্যেই দিল্লী যাব।

এক মুহূর্ত্তের জন্য আলোকের মুখখানি মলিন হইয়া গেল; আবার ভোরের আকাশের মত একটু একটু করিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িতেই, হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তুমি ত ওকালতী করনি বল্লেই হয়, কিন্তু মিছে কথার পশার এত পেলে কি করে বল ত ?

সুরেন মুখ তুলিতে, আর একটু হাসিয়া বলিল—এই যে আমি আস্‌তেই বলে উঠলে, দরকার ছিল, হ্যাঁ তা-তা হ'য়ে গেছে।

সুরেন তখনও নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়াছিল। আলোক সহাস্যে কহিল আমাদের (সে মাসীমার গৃহ-ই আপনার জানিত) বাড়ীর পাশের বাড়ীর একটি উকীল আছেন, তিনি একদিনে দু'শ বাহাত্তরটা মিছে কথা বল্‌তে পারেন, ম্যাক্সিমাম্ গোনা হ'য়েছিল। তিনিই আমাদের বলেছিলেন বড় উকীল হ'লে তিনি দু'তিন হাজার বলতে পারবেন। সে নতজানু হইয়া

সুরেনের পাশটিতে বসিয়া সোহাগভরে বলিল—হ্যাঁ গা তুমি কোনদিন গুণেছ, কটা পার?

সুরেন রায় হয় ত সেই প্রকৃতির লোক যাহারা ক্রুদ্ধ আততায়ীকেও মিষ্ট করিয়া বলিতে পারে, আহা-হা, তোমার জন্য আমি দুঃখিত; কিম্বা সমস্ত বৃত্তিগুলির গলা চাপিয়া সৌজন্য দেখাইতে পারে তাহাকেই, যে তাহার অনেক ক্ষতিও করিয়াছে।······সে একটু হাসিয়া বলিল—একদিন গুণে দেখ্‌ব।

চোখের এ গুণ আছে, সব হাসিকে হাসি বলিয়াই ধরিয়া লয়—তাহার মধ্যে যেন কোনখানটা অপ্রাকৃত, বা কৃত্রিম কিছুই থাকিতেই পারে না, অন্ততঃ কোন একজনের হাসিটি চাহনাটি অন্য আর একজনের চোখে মুখে ছাপাইয়া পড়ে, এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে তা সে কুৎসিতেরই হোক্ সুশ্রীরই হোক্। পতির হাসিটি হয় ত দয়িতার চোখের তৃপ্তিকর বলিয়া হোক্ ভোরের আকাশে তরুণ অরুণের ছায়া পড়িতেই হোক্ আলোকের মুখখানি বিভাসিত হইয়া উঠিল, সে হাসিয়া বলিল—সেই মনি বাবু বলতেন, সাধারণ লোক যারা মিছে কথা কয় একটা পাপ করে, আর বড় উকীলরাও একটাই করে যেহেতু তারা আত্মা আত্মীয় দু'টিকেই তৃপ্তি আনন্দ, চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় দিচ্ছেন কিন্তু আমাদের দু'টো করে পাপ হয়। কি রকম জান, এইধর আমরা মিছে কথা কই—এক, পাপ, দুই, যে তবু না পাই আত্মা বা আত্মীয়ের মনস্তুষ্টি করতে, না পারি একটা ধর্ম্মপথ ধরে চলতে। একটু থামিয়া আবার বলিল—তা আমরা বলতুম, ধর্ম্ম-পথে চলতে বাধা কি-তা বলতেন আরে করব কখন বল! অদৃষ্ট মক্কেলদেবতার আশায় বই খুলে বস্‌তে বস্‌তেই বেলা ৯টা, চল্ আদালত!

না গেলে যেন দিনটাই বৃথা! ফিরে সন্ধ্যায় সেই দেবতারই ধ্যান, বই খোলা, ঘড়ি দেখা, বিরহীর বুকের মত শব্দমাত্রেই চম্‌কে ওঠা তারপর নিদ্রা!—সেটা ত আর পুরীতে জগন্নাথকে দান করে আসি নি, কেবল বাকী রইল ছ'টি জিনিষ মক্কেলও এল না. ক্ষুধামান্দ্য থাকায় রাত্রিতে আহারটা। কেন-না বাসার ঠাকুরটি এমনি মহাপ্রসাদ ভোগ লাগাচ্ছেন যে বাসাখরচের খাতা দেখলে জগন্নাথের মতই হাত পা আড়ষ্ট হ'য়ে গেলেও আসলে ছবেলার কোন বেলাই উদর দেবতা বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট হ'তেন না। কাজেই ছ'টো ছ'টো পাপ হ'ত। কিন্তু তোমার এ উপদ্রব কেন?

সুরেন জিজ্ঞাসিল—উপদ্রব কিসের?

আলোক সরল ভাবে বলিল—উপদ্রব কিসের? ধর তুমি আমাকে খুঁজছিলে ঐ দিল্লি যাওযার খবরটা দেবে বলে, কিন্তু আমার একটু আস্‌তে দেরী হ'য়েছে কিম্বা যে কারণেই হোক্ একটু গোঁসা হ'য়েছে, অমনি মিথ্যে কথা…

সুরেন কথাটা শেষ করিয়া দিতেই বলিয়া ফেলিল—বেশ, কয়ে থাকি কয়েছি।……তা, ভগ্নিপতিটি গেছেন! টাকা কড়ির দরকার ছিল না-কি?

এই সন্দেহটাই আর একবার একটু আগে বুকে জমিয়াছিল, আলোক তাহা ভুলিয়াও গিয়াছিল। ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার পিঠে অনেকক্ষণ চাবুক না পড়িলে বেগ যেমন মন্দীভূত হইয়া আসে, আলোকও সব ভুলিয়া হাসি তামাসায় মন দিয়াছিল, কিন্তু এ কথায় তাহার গ্রীবা ফুলিয়া উঠিল। রক্তাক্ত মুখে যথাসম্ভব সহজস্বরে বলিল—সব গরীবই

কেবল টাকা চাইতে আত্মীয়ের বাড়ী আসে না; অন্ততঃ আত্মমর্য্যাদা তা'দেরই বেশী থাকে, চক্ষুলজ্জা তাদেরই পীড়া দেয় এমন, যা তোমাকে আমাকে দেয় না, তোমার লাটের দরবারের কোন বাবুমশায়কেও দেয় না।—স্বর নামাইয়া বলিল—টাকা চাইতে আসেন নি!

ঝগড়া করিয়া বাপের তিরস্কারে ছেলে যেমন গোপনে কেবলমাত্র দেয়ালটাকেই আত্মীয়জ্ঞানে খেদোক্তি করে সুরেন ঘড়িটার দিকে চাহিয়া নতমুখে বলিল—কি মুস্কিল! আমি ত সত্যিই রাগের কথা বলিনি আলো।

অন্য মেয়ের কি হইত জানি না, আলোকের সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া প্রায় শীতল হইয়া গেল। সুরেন তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্যই অনুনয়ের স্বরে বলিল—আচ্ছা আজ পর্য্যন্ত কোনদিন শুনেছ আমি বড়াই করিছি? ঠিক করে বল! খুব করে মনে কর!······

আলোক লজ্জিত মুখে কহিল—না, না কথাটা টপ্ করে বেরিয়ে গেছে, রাগ কর না।

পাগল আর কি? বলিয়া সুরেন উঠিতেছিল, আলোক বলিল—দেখ, অজয় বাবুর সঙ্গে আমি একবার যাচ্ছি। বেচারার খাওয়া দাওয়া দেখাশুনার একটা বন্দবস্ত করতে হ'বে ত। দিদির সঙ্গে সত্যি উনিও ত আর যেতে পারেন না! কি রকম হ'য়ে গেছেন দেখনি? একেবারে পাঙ্গাস্, কোথাও যেন এক ফোঁটা রক্ত নেই চোখ দু'টো ঘোলা—দেখ্‌লে কষ্ট হয়! এক একটা নিঃশ্বেষ পড়ছে না ত, যেন রক্ত ঝরছে!

সুরেন আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসিল—তোমার দিদি দেখ্‌তে কেমন ছিলেন? মানে এ্যাঁ তোমার চেয়ে ক'বছরের বড় ছিলেন তিনি?

শুনি ত ছ'বছরের, দেখে মনে হ'ত অনেক বেশী। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিষণ্ণ ম্লানমুখে বলিল—যাই। তাঁকে বসিয়ে রেখে এসেছি।

সুরেন জিজ্ঞাসিল—সঙ্গে কা'কে নিচ্ছ?

মধুকে নিই আর নেত্যর মা চলুক, বামুন একটা সেইখানেই ঠিক ক'রে দেব—কি বল?

তাই দিও, বলিয়া সুরেন রায় কাগজ পত্র খুলিয়া বড় বড় চিন্তায় আত্মসমর্পণ করিল।

—১০—

এ ঘরে আসিতেই দেখিল, গোল টেবিলটার উপরে চিৎ হইয়া অজয় পড়িয়া আছে। বাহির হইতে ডাকিয়া কোন সাড়া পাইল না। ভিতরে ঢুকিবা মাত্র অজয় উঠিয়া বলিল—আর পারিনা। এই যে, আমি যাই?

চলুন!

অজয় উঠিয়া দাঁড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল—বড় কষ্ট হ'চ্ছে আলোক— বলিতে বলিতেই সে আবার শুইয়া পড়িল।

আধঘন্টার মধ্যেই ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিল—কিছু নাঃ এক্‌-ঝাস্‌-চান্‌। চার আউন্স ব্যাণ্ডি আর......

সুরেন ডাক্তারখানায় মোটর ছুটাইয়া দিল। বাড়ীতে হুইস্কীর অভাব ছিল না, খানিকটা অজয়ের গালে ঢালিয়া দিবে কি না ভাবিতেছিল, অজয় তড়াক্‌ করিয়া উঠিয়া বলিল—চল্লুম!

সুরেন হাসিল, কিন্তু সে-হাসির একান্ত উপাসকের চোখেও ভালো লাগে নাই সে অজয়ের হাতটা টানিতে টানিতে সুরেনের গায়ের পাশ দিয়াই বারান্দায় বাহির হইয়া গেল, বলিয়া গেল—কি হাস! না আছে মাথা, না আছে তার মুণ্ডু।

আলোক তাহাকে টানিয়া দ্বারের বাহির পর্য্যন্ত আনিয়াছিল, অজয় সেখানেই বসিয়া পড়িল। তাহার দুর্ব্বলতা যে কত বেশী আলোক তাহা স্পষ্ট জানিয়াছিল, সেই দুর্ব্বল ব্যাক্তি যখন সবলে সুরেনের সন্নিধ্যত্যাগ করিল, তখন পার্থক্যটা যে কি তাহাও একেবারে দিনেরবেলার মত সাফ হইয়া গেল। সুরেন সঙ্গে সঙ্গেই কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল আলোক দীপ্তস্বরে কহিল—উঠুন, অজয় বাবু।

অজয় উঠিল, নীচে গাড়ী তৈয়ার ছিল, পতিতেরও পরিচিত গৃহ, মোটর ক্ষুদ্র গলিটার মধ্যে ঢুকিতেই সুন্দরী ঝি দ্বার খুলিয়া রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে ঝগড়া করিতেই আসিয়াছিল (কাহার সঙ্গে তাহা না জানিয়াও) সামনে সেই সুন্দর-চোখ মেয়েটিকে দেখিয়া শান্ত শীতল শিষ্টের মত দরজাটি উত্তমরূপে খুলিয়া দিল। সেই মেয়েটিই আগে নামিয়া অজয়কে হাত ধরিয়া নামাইয়া লইল। একটু দূরের রোয়াকে দশপণেরোটি যুবক বসিয়া মতি বাঈজির কসরতের তারিফ করিতেছিল, তাহারা বেশ চনমনে হইয়া উঠিয়া, ব্যাপারটা কি দেখিতে আসিতেছিল। হঠাৎ সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীর কথায় লজ্জা পাইয়া পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রমণী অজয়কেই বলিল—কি পাড়াতেই বাস করেন, ভদ্রতাজ্ঞান অবধি নেই আপনার প্রতিবেশীদের! তাহাদেরই একজন পতিত বাবুকেই নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিলেন—গাড়ীটা কার ম'শাই? উলিস্ নাইট্ বুঝি? বেড়ে গাড়ী, কার বলুন ত!—যে নাম শুনিল, তাহাতে পরচর্চ্চার ইচ্ছাটা মোটেই স্ফূর্ত্তি পাইল না, আবার মতি বাঈজীর কসরতের আগুশ্রাদ্ধ আরম্ভ হইল।

তাহাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া আলোক রোয়াকে আসিয়া

হস্তেঙ্গিতে পণ্ডিতকে ডাকিয়া স্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে বলিল, গাড়ীর এখন দরকার নেই। আপনি ন'টার ভেতর আস্‌বেন। বলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল, এবারে দেখিল, হতভাগারা অন্য দিকে চাহিয়া বিড়ি ফুঁকিতেছে।

সামান্য একটা জিনিষ কি জানি কি কারণে অনেক সময় বড় হইয়া আলোকের মনে দেখা দিত। সে যখন সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল যে অজয় দুই জানুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া আছে তখন সেই ঘর, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সব মিলিয়া এক হইয়া তাহার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা করিয়া দিল! শোকে কি করিয়া সান্ত্বনা দিতে হয় আলোক তাহা জানিত না ; সব শোকের সান্ত্বনা আছে কি না তাহাও সে জানে না ;—সে অদূরে দাঁড়াইয়া ক'দিনের আগের দেখা ঘরখানি বিস্ফারিত নেত্রে দেখিয়া লইতেছিল, সুন্দরী ঝি বিদায় চাহিতে আসিয়া এক এক করিয়া কুমুদের মৃত্যু কাহিনীটা বিবৃত করিয়া গেল। সে যে মৃত্যুকালে বার বার তাহারই নাম উচ্চারণ করিয়াছিল সুন্দরীর মুখে আলোক তাহাও শুনিল। অর্থাভাবে কুমুদের চিকিৎসা হয় নাই, কেহ এক দানা বেদানা কি একটু আঙ্গুরের রস কিছুই খাইতে দেয় নাই শুনিয়া আলোক একবারে দিশেহারা হইয়া গেল।

অজয় প্রতিবাদ করিল না, সে সমস্তই শুনিতেছিল, সুন্দরীর কথা শেষ হইবামাত্র সে মুখ তুলিয়া আরক্তনেত্রে কহিল—শুধু সে কায়মনে তোমাকেই আশীর্ব্বাদ করে গেছে আলোক।

আলোক গমনোদ্যত সুন্দরীর হাত ধরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল—আজ আর এখন তুই যাস্‌ নে মা।. একটু থাক্‌।

ঠিকা ঝি পাঁচবাড়ীর কাজ করিয়া বেড়ায় এমনই নানান্ কৈফিয়ৎ দিয়া সুন্দরী অক্ষমতা জানাইতেছিল, আলোক আঁচলের খুঁট খুলিয়া একখানা পাঁচ টাকার নোট তাহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া বলিল—কি করবি বল্ মা, বিপদ-আপদ ত সকলেরই আছে। আমি যতক্ষণ আছি থাক্। একলা থাকতে আমার সাহস হ'চ্ছে না!

অজয় আর একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, পরক্ষণেই জানুর মধ্যে মুখাবৃত করিয়া কেবলমাত্র একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

সুন্দরী বিপদে বুক দিয়া পড়িয়া থাকিতে পারে এমনি ধারা একটা আশ্বাস দিয়া বলিল—কেন যে এনারা তোমাকে খবর দিলে না দিদিমণি সে বাপু আমি বুঝি নে। তবে একথা আমি বল্‌তে পারি তুমি এলে দিদিমণির পেরাণটা যেত না। আচ্ছা দিদিমণি তিনি ত তোমার আপনার বহিন ছিল?

ছিলই ত!

তবে খবর দিলে না কেন বল দেখি? আপনারা বড় নোক বলে বুঝি?

এই কথাটায় আলোক চমকিয়া উঠিল। সুরেন রায়ও এই কথাই বলিয়াছিল তাহাতে সে ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। সব চেয়ে দুঃখ এই যে অজয় তাহাকে অন্যরূপ ভাবিল কি করিয়া? কুমুদ যে স্নেহের বোন্‌টিকে দেখিবার আশা মরণ কাল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে নাই নিজের কানেই সে কথা শুনিয়াছে, কিন্তু এতখানির বিনিময়ে অজয় তাহাকে কেন যে ব্যথা দিল কিছুতেই সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

রাত্রে আহারাদির পর সে অজয়কে বলিল—দেখুন আমার মধু চাকর

এখানেই রইল আজ থেকে। সে ওবাড়ী থেকে বিছানাপত্র আন্‌তে গেছে, এল বলে।

শুনিয়া অজয় গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসিল—আমি ওর মাইনে দেব কোথা থেকে?

মাইনে আপনাকে দিতে হ'বে না। শুধু একটু আশ্রয় দিতে হ'বে। পারবেন ত?

অজয় আলোকের মুখের পানে চাহিয়া পূর্ব্ববৎ কহিল, এখানে তার থাকবার কি বিশেষ দরকার আছে। আমার ত মনে হয়......

আলোক বিরক্ত হইয়া বলিল—আপনার মনের কথা প্রকাশ করে কাজ নাই। তা'তে অনেক অপ্রীতিকর অপ্রয়োজনীয় কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়তে পারে সে থাক্, আমি যা বলি শুনুন। মধু এখানেই থাক্‌বে আর ঐ উড়ে বামুনটা ও সকালে বিকালে রেঁধেবেড়ে আপনাকে খাইয়ে যাবে বুঝলেন? হ্যাঁ, আর একটা কথা এ সব বন্দোবস্তে আপনার হাত দেবার দরকার নেই—মনে থাক্‌বে ত?

অজয় উত্তর দিল না; কিন্তু তাহার মন বলিতেছিল, থাকিবে। যতদিন সে বাঁচিয়া থাকিবে, ভুলিবে না। একমাত্র কুমুদ তাহাকে বহুদিন এমনই সতর্ক শাসনে রাখিয়াছিল, সেও ভুলিবার নয়, এ'ও চিরদিন তাহার মনের পাতায় উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

মধু ঘরে আসিয়া সবিনয়ে জানাইল গাড়ী আসিয়াছে।

আলোক দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—তা হ'লে আমি যাই। সকালে আসবার দরকার হ'বে কি? বলেন ত আসি।

একমুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া, অজয় উদাসকণ্ঠে কহিল—দরকার! কি আর হ'বে! কিছু না।

বোধ করি অনুরূপ আশা করিয়াছিল বলিয়াই কথাটা আলোকের মনঃপূত হয় নাই। সে ক্ষুন্ন হইয়া বলিল—বেশ। তবে আর আসব না।

অজয় কথা কহিল না।

—১১—

সুরেন বলিল—মিঃ ব্যানার্জ্জি চ্যাটার্জ্জি সবাই সস্ত্রীক যাচ্ছেন এই দেখ চিঠি, তাঁরা আমাকেও বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন যাতে তুমিও আমার সঙ্গে যাও!

আলোক চিঠিখানা দুবার পড়ল। ইংরেজীতে লেখা। মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিয়াছেন বটে, লাটপত্নী সিমলায় একটী নারী-শিল্প-প্রদর্শনী খুলিবেন, তাহাতে যোগ দেওয়া প্রত্যেক মহিলারই অবশ্য কর্ত্তব্য। এবং মিসেস্ রায়কে সঙ্গে লইয়া যাইতে বিশেষরূপ অনুরোধ করিয়াছেন। পুনশ্চে সিমলার প্রাকৃতিক দৃশ্যে শ্রীমতী রায় যে অত্যন্ত পুলকিত হইবেন এ ভবিষ্যদ্বাণীও লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সুরেন বলিল—তুমি ছিলে না, মত নিতে পারিনি তার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু।......

আলোক বিস্ময়পূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসিল—কিন্তু কি?

সুরেন ইতঃস্তত করিয়া বলিল—মিঃ ব্যানার্জ্জিকে আমি লিখে দিয়েছি যে তুমি যাবে।

আলোক নতমস্তকে দু'এক মিনিট ভাবিয়া বলিল, কিন্তু আমি যাই কি করে? যে রকম দেখ্ছি......

বাধা দিয়া সুরেন বলিল—কিসের? অজয় বাবুর? আমি ত

শুনলুম তাঁর সমস্ত সুব্যবস্থা তুমি করে দিয়েছ। বিছানা নিতে এসে মধু আমাকে বলে গেল।

আলোক ভারি গলায় বলিল—কিন্তু দেখ্‌লে ত কি কাণ্ডই না করে বস্‌লেন! এখানে তাই, অন্য যায়গায় হ'লে কেই বা দেখ্‌ত, কেই বা কি করত!

চাকর বাকর রইল তারা দেখ্‌বে শুন্‌বে। তুমি থেকেও তাদের চেয়ে বেশী কি করতে পারবে বল? তাদের দ্বারাই সব ত! তারাই করবে। মধু হুঁসিয়ার পুরোনো লোক।

আলোকের উত্তর দিবার কথা অনেক ছিল কিন্তু একটাও ঠিকমত তাহার অধরে জোগাইল না। যদিও বা একটি জোগাইল, কেবলমাত্র নিজের তর্কেই তাহা ত্যাগ করিতে হইল। সত্যই ত তাহার স্বামীর এ সস্নেহ আহ্বান সে ত্যাগ করিবে কিসের বাহানায়? মনে পড়িল যেন বহুদিন ধরিয়া এমনি একটা আহ্বানের জন্য তাহার কান দুটি প্রস্তুত হইয়াছিল; সে সুমধুর বার্ত্তা যেন অনেক দিনের অনেক অস্পষ্ট প্রার্থনাই তাহার মনকে জাগাইয়া দিল।

সুরেন একটু পরে বলিল—শুধু তাই নয় আলোক। আমি কথা দিয়েছি।

আলোক সস্মিতমুখে কহিল—পরশু ত? যাব।

সুরেন সস্নেহস্বরে বলিল—কাল দুপুরবেলা তুমি অজয় বাবুদের বাড়ী যাবে কি?

আলোক আসিবে না বলিয়া আসিয়াছিল কিন্তু কি জানি কোন্ উপদেবতা তাহাকে বারবার সতর্ক করিয়া দিতে লাগিল যে এত

নিষ্ঠুরতা তাহার উপর চলে না। সে যে নিতান্ত নিরুপায়, একান্তই অসহায় !

আবার মনে হইল, হয়ত তাহার কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমার অদর্শনে তাহার কি আসে যায়। কৈ সে ত একটিবারও ক্ষুদ্র কথায়ও আমাকে আসিতে বলিল না। তবে কেন সে তাহারই কথা ভাবিয়া নিজের জীবনের এ পরম শুভমুহূর্ত্তে এই শত শত কামনা-বাসনা বিজড়িত পরম সমাদরের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে? না, সে স্বামীর সঙ্গে যাইবে! মন জানে, আজ স্বামী তাহাকে চাহিয়াছেন, তবে অন্যের কথা ভাবিয়া তাহাকে অগ্রাহ্য করিবে না।

কিন্তু মনের মন বলিল না, তাহাকেই না বলিয়া সে কোথাও যাইতে পারে না, যাইবেও না!

সুরেন আলোককে নীরব দেখিয়া পুনরায় বলিল—না যাও, আমিই একটা চাকর দিয়ে খবরটা মধুকে দিয়ে পাঠাব 'খন।

আলোক মুখ তুলিয়া বলিল না, না কাউকে পাঠাতে হবে না।

সুরেন বলিল—সেই ভালো। তারা যেমন আছে থাক, সরকার মশাই দরকার মত টাকা কড়ি দেবেন।

একমুহূর্ত্তে আলোক পাংশু হইয়া গেল, বলিল— না, না, আমি কাল যাব সেখানে। সকালেই যাব।

ওঃ, যাবে! তা বেশ, বলেই এসো। হ্যাঁ দেখ ঐ ভূপতি সেন বড্ড আড়ে হাতে লেগেছে। শুন্‌ছি······

সিমলের কিসের মেলা হবে বল্লে? গোশালা······

না, না শিল্প······

ও-হো, মনে পড়েছে!—সে দৈনিক সংবাদ পত্রখানি তুলিয়া লইল।

সুরেন আরম্ভ করিল, শুনছি ভূপতি সেন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভোট ভাঙ্গাবে।

কাগজের যেখানটায় চোখ ছিল সেইখানেই ভোটসংক্রান্ত কি একটা খবর দেখিয়াই অকস্মাৎ মাথা তুলিয়া আলোক বলিল—তুমি ভাঙ্গাও নি?

সুরেন নির্বাক। কথাটা বিন্দুমাত্র নূতন নয়, কিন্তু আলোকের মুখের ভঙ্গী, বলিবার কায়দাটি সম্পূর্ণ নূতন। এবং হতভাগ্য ভোটবিলাসী সুরেনের চোখে বা কানে কোনটিই মধু বর্ষণ করিল না। কিন্তু সে নাকি অসাধারণ ধৈর্য্যশীল, সহাস নেত্রে চাহিয়া বলিল—না ভোট আমি ভাঙ্গাই নি, আমি আমার স্বপক্ষে লোক খুঁজেছিলুম মাত্র।

আলোক বলিল—তিনিও তাই কর্চ্ছেন। একটু থামিয়া বলিল—যে মহাপুরুষরা আশা করেছিলেন ইংরেজের সভাগৃহ এ-দেশবাসীর শ্রীচরণের ধুলিতে বঞ্চিত হবে তাঁরা না কি বাঙ্গালা দেশেই সভা করে গেছলেন; এবং সহরের পথে পথে চেঁচিয়ে কাগজ ছেপে বেড়িয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তোমাদের অস্তিত্ব জানতেন না—কি বল? তা'হলে কখনই বলতেন না, নয়?

হুঁ—গাজাখুরী - বলিয়া তাচ্ছিল্যভরে দৈনিক পত্রখানি চোখের সামনে ধরিয়া বলিল—আরে বাপু সেকি হবার যো আছে! সাধে বলি মাথা খারাপ, হুঁ! এই যে ছোঁড়াগুলো স্কুল পাঠশালা ছেড়ে এক একটি গরু হ'তে চল্ল—এরা করবে কি বল দেখি! গোশালে যাবে তারা?

আলোক আরক্তমুখে দীপ্তস্বরে কহিল—গরু যেখানে থাকে সেইটেই গোশালা—সে শুধু তারা যেখানটা যাবে সেখানটা নয়। আর যদি তাই হয়—তারা গোশালাতেই যাবে—নাম বদলে নর্দ্দামায় পড়ে মরবে না।

এ অবস্থায় সুরেন বরাবর যাহা করিয়াছে, আজও তাহাই করিল। সে এমনি নিবিষ্টচিত্তে কাগজ পাঠ করিতে লাগিল যে বিদ্যুৎ বাতী সুইচ্ অফ করিয়া দিবার দুই তিন মিনিটের মধ্যেও কাগজ সরাইল না।

———

—১২—

গভীর রাত্রে সুনির্জ্জনে আলোক নিজের মনে বারম্বার এই আলোচনাই করিল যে, স্বামীর এই আহ্বানটা যেন তাহাদের দাম্পত্য-জীবনে প্রথম প্রণয়গ্রন্থি পড়িল ; সে স্বীকার করে না কোন জাতিরই দাম্পত্য-প্রণয় কেবল মাত্র সংস্কার বশেই জন্মিয়া থাকে। সে কতবার বলিয়াছে—যতবড় সংস্কারের মহিমাই পিছনে থাকুক, বিবাহের পর নিজের অবস্থাটি সম্যক বুঝিয়া লইতে তাহার সাতদিন সময় লাগিয়াছিল। বিবাহ-সম্বন্ধে সব মেয়েই হয়ত অন্তরে পুলকিত হইয়া থাকে। অনেকে বলিবেন সংস্কার, আমি বলি সে কেবল নবীনত্বের আকাঙ্খায়। সব নবীনত্বের মতই সেও বর্ণ গন্ধ সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ !—জীবনের সেই সুখবসন্তে অনেকেই মত্ত মধুপের মত মাতোয়ারা হইয়া যান্, তাঁহারা সৌভাগ্যবতী সন্দেহ নাই, আর কেহ তাহারই মত পিপাসু, ক্ষুধার্ত্ত উন্মুখ হৃদয় উন্মুক্ত রাখিয়া চির উপবাসীর মত দুয়ারে লুটাইতেছে।

সুরেনের ঔদাসীন্য হতভাগিনী নারীকে তিলে তিলে জ্বালা দিত, অথচ না পারিত তাহার কারণ বুঝিতে, না পারিত প্রতিকার করিতে।

সে ত স্বচ্ছতোয়া পানশীতল জলে পূর্ণ জলাশয়, কিন্তু পথিক যে পানাসক্তিশূন্য, তাহার আদর কে বুঝিবে !—আজ তাহার মনে হইল এই

সে শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। কাহার' ভাগ্যফলে মধুময় মুহূর্ত্ত সত্বর আসিয়া থাকে, তাহার বিলম্বে আসিয়াছে, তাহাতেও ক্ষতি নাই, বিনা আহ্বানে সে তাহাকে বিদায় দিবে না।

নিজের প্রস্তাবের অনুকূল যুক্তি চিরদিনই আছে—সে বলিল--দিদি হ'লেও, পরিচয় ত সেই পাঁচটি দিনের! কি এমন মায়া পড়তে পারে! শুধু তাই, ইনি আবার আমাদের পছন্দই করেন না!— না সে সিমলা যাইবে। নারীশিল্পপ্রদর্শনী দেখিবার আগ্রহ তাহার অত্যন্ত অল্প হইলেও পাঁচদশমিনিটের মধ্যে কলকাতার আলো বাতাস যেন অত্যন্ত ভারী হইয়া তাহার শ্বাসরোধ করিতে লাগিল।

আশু বিদেশ গমনের ছবিটি যতবারই তাহার মনে পড়ে—ততবারই কোথাকার একটা মলিন মুখ, করুণ দৃষ্টি চোখে পড়িতে সে ক্রমাগতঃ অন্ধকারেও চোখ মুদিতে লাগিল।

সে মনও পরাজয় মানিল। নারীর ঐকান্তিক কামনা প্রাণ থাকিতে কোন নারীই হেলায় হারাইতে চাহে না—বিদায় লইতে সকাল বেলাই অজয়ের বাড়ী উপস্থিত হইল।

অজয় তাহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল, সারারাত তোমার কথাই ভেবেছি, তাই প্রভাতে তোমাকে দেখতে পেলুম!

মুহূর্ত্তের জন্য আলোকের মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু যে মুহূর্ত্তেই অজয়ের শান্ত স্নিগ্ধ সরল নেত্রদ্বয়ের ছায়া তাহার চোখে প্রতিফলিত হইল, রক্তাভা অল্পে অল্পে অপসৃত হইয়া গেল।

অজয় বলিল—তুমি বলে গেছলে আসব না, কিন্তু আমি জানতুম তুমি আসবেই।

আলোক কি একটা বলিতে গেল, অজয় ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই মনের উল্লাসে বলিতে লাগিল—তুমি যেন অভয়, সাহস, শান্তি, স্নেহ, করুণা—সব! আলোক, আজ থেকে আমি আফিস যেতে আরম্ভ করব।

আলোক উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল—সে ত খুব ভালো!

অজয় শান্তগম্ভীর স্বরে বলিল—কিন্তু এসে কি দেখব আলোক? দেখ্‌ব, আমার ঘরের আলোক জন্মের মত নিভে গেছে, জন্মের মত অন্ধকার হয়ে গেছে?

তাহার নিশ্বাসের প্রবল উষ্ণ বাতাসেই যেন আলোক কাঁপিয়া উঠিল। অজয়ের সজল মুখ কল্পনা করিয়াই সে মুখ নমিত করিল।

অজয় আর্ত্তের মত বলিল—আলোক, ফিরে এসে আমি কি তোমাকেও দেখতে পাব না?

আলোক সজলকণ্ঠে কহিল—বৈকেলে আমি থাক্‌ব।

তাই থেকো আলোক। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। এ বেলাই সিমলা যাত্রার সংবাদটি দিয়া যাইবার ইচ্ছা কিন্তু এই যে লোকটা সমস্ত বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল, তাহার একদিনের এই প্রার্থনা ব্যর্থ করিবার মত কঠিনতা তাহার ছিল না। ও-বেলা আসিয়া কিছুক্ষণ থাকিয়া সুযোগমত বলিলেই হইবে ঠিক করিয়া রান্নার আয়োজন করিয়া দিতে লাগিল।

কুমুদ জীবিত থাকিতে একবার সে গরীবের ঘরের ঘর-সংসার নাড়াচাড়া করিয়া গিয়াছে, তখন যে কোন জিনিষ যত অল্পই হউক খুঁটিনাটি সব ছিল। আজ আবশ্যকীয় কোন সামগ্রীই তল্লাস করিয়া মিলিল না। মসলার হাড়ীতে দু'একখণ্ড হরিদ্রা কঙ্কাল, কতকগুলি

ছিন্নভিন্ন শূন্য কাগজের ঠোঙ্গা পড়িয়া আছে। চাউলের কলসীর মধ্যে জন্তু বিশেষ পুত্রকলত্র লইয়া কোলাহল করিতেছিল, উপুড় করিতেই কিচ্‌মিচ্‌ করিয়া কেবলমাত্র তাঁহারাই দর্শন দিলেন। তেলের ভাঁড়টি ত ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। উনানে আগুণ দিবার কয়লা নাই, গোটা পাঁচেক দেশলাই বাক্স, আধখানা কাঠিও নাই—দেখিতে দেখিতে আলোকের চোখের পাতায় জল জমিয়া উঠিল। লোকটা পাঁচদিন আহারের মুখ দেখে নাই—বাড়ীর উনানে অগ্নিসংযোগ হয় নাই নিশ্চয়, যে লোক, অন্য কোথাও হইয়াছে এমন বিশ্বাসও করা শক্ত।

আলোক মধুকে কাগজ পেন্সিল আনিয়া ফর্দ্দ লিখিয়া লইতে বলিল। —একমাস চলিতে পারে, সেই পরিমাণ সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিতে পাঠাইল।

ঠাকুর নিকটের দোকান হইতে এখনকার আবশ্যক মত সামান্য দু' একটা জিনিষ আনিয়া লইয়া রাঁধিতে বসিয়া গেল। অজয় যথাসময়ে স্নান করিয়া আহারে বসিল।

আলোক বলিল—এই কি আপনার খাওয়া? এ মিছে বসাই বা কেন, আর হাঙ্গামা করে রাঁধাবাড়াই বা কেন?

অজয় হাসিয়া বলিল—পাঁচদিন উপবাসের পর কোন জিনিষই ভালো লাগল না।

রান্না খারাপ হয়েছে বুঝি?

সে-যে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে এবং উত্তরের জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে বুঝিয়াই অজয় তাড়াতাড়ি বলিল—না, না, খারাপের জন্যে নয় আলোক—আমার খাওয়াই ঐ।

মিথ্যে বলে ত লাভ নেই, ধরা ত পড়বেই একটু পরে। আমার বামুন রেঁধেছে চক্ষুলজ্জায় নিন্দে কর্ত্তে আপনি পারছেন না, কিন্তু আমার কাছে ত সবই প্রকাশ হ'য়ে যাবে। আমি যখন দুপুরবেলা আছি……

অজয় উল্লসিত হইয়া বলিল—হ্যাঁ তুমি থাকবে বলেছ? এসে আমি দেখতে পাব তোমাকে? ঘাড় নাড়লে হবে না, বল……

বলছি ত থাক্‌ব, থাক্‌ব, থাক্‌ব, নিন্ হয়েছে এবার?

অজয় আহার শেষ করিয়া জামা পরিল, তারপর আস্তে আস্তে ছাতাটি লইয়া বাহির হইয়া গেল। আলোক সদর দরজা পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়াছিল, দরজাটি বন্ধ করিয়া আর একটি পা'ও সে নড়িতে পারিল না। পাতাল হইতে কে যেন দুবাহু বাড়াইয়া পা দুটিকে ক্রমাগত নীচের দিকে টানিতেছিল। দরজার একটা যায়গা কোন্ শান্ত ছেলের ইঁটের প্রভাবে খসিয়া গিয়াছিল, সেটায় চোখ্ দিলে মোড়টা পর্য্যন্ত সাফ দেখা যাইত—সেখানে চোখ রাখিয়া বহুক্ষণ সেই শীর্ণ লোকটিকে দেখিতে লাগিল, দেখিয়া ফিরিতেছে, অকস্মাৎ মনে পড়িল কখন্ ফিরিবে তাহা ত জানিয়া লওয়া হয় নাই। তাহার গোছাইয়া গাছাইয়া লইবার অনেক রহিয়াছে যে! কত সম্ভ্রান্ত লোকের সামনে চলাফেরা করিতে হইবে—এঃ! ভারি ভুল হইয়া গেছে।

পাশের বাড়ীর বধূটির সঙ্গে দু'তিনটি কথাতেই ভাব হইয়া গিয়াছে—তাহাকে ডাকিয়া বলিল—বউদিদি, সদর দরজায় একটা তালা দিয়ে আপনার কাছে রেখে যাব, আমার চাকর বাজার গেছে, ডাকাডাকি করলে পাঠিয়ে দিবেন?

বধূটি স্বাধীন নয়, ওদিকে ফিরিয়া মৃদুস্বরে কি কথা কহিল, আবার

ফিরিল, বলিল—তা দিয়ে যান্। আর একবার ফিরিল, কি শুনিল, বলিল—দিদি জিজ্ঞাসা করছেন, আপনি আবার বৈকেলে আসবেন ত? অজয় বাবুর ফেরার আগে?

আলোক একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—আসব। আমাকে তাই বলে গেছেন।

বধূটি বলিল—তাই বল্‌ছি।

এ যে তাহার নিজের উক্তি নয়, আলোক তাহাও বুঝিল—ইহাতে সে অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল,—তখনই সেই বধূটির কথাতে সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল যে এমন একটি দিদি সেখানে আছেন যাঁহার কান এ বাড়ীর সর্ব্বত্র বিরাজ করিয়া আছে।

আলোক শুনিল, অদৃশ্যকণ্ঠে কে বলিল—রাধা, (বধূটির নাম রাধারাণী) ওঁকে বল্, চিরদিন ও-বাড়ীর খবর আমরা রাখি।

রাধারাণী কোন কথা বলিবার আগেই আলোক বলিল—তাই দেখ্‌ছি।

বধূ বলিলেন—ক'দিন বিপদ হয়েছে, দিদিই ত বারবার আমার দেওরকে দিয়ে......

অদৃশ্যস্বর কহিল—আঃ রাধা, থামনা ভাই।

বধূ থামিয়া গেল, কিন্তু এ বিস্ময় কিছুতেই নিবারিত হইল না যে এই শুভার্থিনী দিদি কেন স্ত্রীলোকের সম্মুখেও আত্মপ্রকাশ করিলেন না। আলোক বলিল—আপনার দিদিকে ডাকুন না।

এবার বধূ নিজেই জবাব দিল—তিনি পোড়ার মুখ কাউকে দেখাতে

চান না ; বলেন, ভগবান যাকে পুড়িয়েছেন সে মুখ কাউকে দেখান শোভা পায় না।

আলোক আর কিছুই বলিল না।

একখানা খালি ঠিকা গাড়ী সোওয়ার নামাইয়া ফিরিতেছিল সেখানাকে দাঁড় করাইয়া চাবী লইয়া নিজেই সেই বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া সেই ঘরেই বিধবাটির পায়ের কাছে চাবী ফেলিয়া নত হইয়া প্রণাম করিল। উঠিয়া বলিল—আপনি মনে করবেন না আমি গুমোর কচ্ছি, কিন্তু এটা সত্যি কথা যে মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম এই বোধ করি আমার প্রথম।

বিধবা হাসিয়া আলোকের মুখের পানে চাহিলেন। বয়স বোধ করি পঁচিশ ছাব্বিশ হইবে। কোথাও কোন বাধা নাই, যৌবন যেন নিঃশঙ্কে আপনার পুরা গৌরব ছড়াইতেছিল। আলোক সুন্দরী অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু কোথাও এমন স্নিগ্ধ মাধুরী, কভ্রকান্তি দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। নিরাভরনা জোৎস্নারাণীর মত উজ্জ্বল দেহখানি বেড়িয়া সৌন্দর্য্য যেন অকাতরে মিশিয়া রহিয়াছে।

বিধবা সহাসনেত্রে কহিলেন—সত্যি বলছি আপনাকে—আপনি না এসে পড়লে কি-যে হোত কিছু বলা যায় না। আমার ত ভারী ভয় হয়েছিল। আপনি এসেছেন খুব রক্ষে।

আলোক একটি কথাও কহিল না। সে যখন ভাড়াটে গাড়ীটার ভিতরে আসিয়া বসিল তখন এই মাধুরীময়ীর মাধুর্য্যে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেছে। কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যই তাহার কারণ নয়, বিগত পাঁচদিন যে তিনি অদৃশ্য থাকিয়াও তাহার আত্মীয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া

শোকাপনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা অল্প আহ্লাদের বিষয় নহে। এক ত এ ঔদার্য্য পরের থাকে না, থাকিলেও যৌবনে অমন নিরাসক্তভাবে প্রকাশ্যে নিঃস্বার্থ চেষ্টায় পরহিতাকাঙ্খা অল্পই দেখা যায়।

অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিতেই ওবাড়ীর রাধা বলিল—আপনার চাকরকে চাবি দিয়েছি।

হ্যাঁ. পেয়েছি।

রাধা পুনরায় কহিল—অজয়বাবু এখনও এলেন না কেন বলুন দেখি? আজ ত শনিবার, আমাদের বাড়ীর সবাই ত অনেকক্ষণ এসে পড়েছেন।

আলোকের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। অসহ ভার বোধে সে যখন আর্ত্তের মত মুখখানি তুলিল, রাধা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু যে অদৃশ্যে থাকিয়া বধুর মুখের বাক্‌সঞ্চয় করিতেছিল সে প্রপীড়িত করুণ মুখের কিছুই জানিল না। পূর্ব্বের মতই বধূ বলিল—উনি ত বরাবরই দু'টোর সময় আসতেন।

আলোক রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসিল—এখন বেজেছে কত?

সাড়ে পাঁচটা—বলিয়া বধূটি সরিয়া গেল। আলোক সামনের ঘরটায় ঢুকিয়া মুখের মধ্যে আঙ্গুল পুরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আফিসের কাজে বিলম্ব হইয়াছে, পথে কাহারো সঙ্গে দেখা হইয়াছে —এসব কোন কথাই ত তাহার মনে হইল না। বেত্রাঘাত করিয়া কে-যেন তাহাকে বলিয়া দিল, সে আসিয়াছিল, শূন্য গৃহ দেখিয়া ফিরিয়া গেছে। কেন সে মরিতে চলিয়া গিয়াছিল, কি দরকার তাহার ছিল -

কখন্ সে ফিরিবে, কোনদিন আর ফিরিবে কি না এই আলোচনা করিতে করিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া গেল। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিতে লাগিল।

একবার ভাবিল, মধু কখন্ আসিয়াছে কে-জানে! বধূটি নিশ্চয়ই জানে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইবে—আলোক সেই জানেলাটির নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। বধূটি মুখ বাড়াইতেই জিজ্ঞাসিল—বউদিদি, চাকরটা বাজার করে' কখন্ ফিরেছিল মনে আছে?

আপনি যাবার একটু পরেই।

সে-যে তদবধি আছে নিঃসন্দেহে জানিলেও তাহাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিতে আলোকের কেন-যে বাধিয়া গেল, সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। মনে হইল, সে-যদি ফিরিয়া যাইত, মধু নিশ্চয়ই আমাকে সংবাদ দিত। এত বড় প্রয়োজনীয় সংবাদটি কি না-দিয়া থাকিতে পারে? আবার মনে হইল, কি জানি। ওবাড়ীর চাকর বাকরগুলো বাড়ীর লোক ছাড়া কাউকেই যে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনে না।—কিন্তু সন্দেহ যত প্রবল হোক বাধা যে অধিকতর প্রবল বুঝিয়াই সে পথের ধারের জানেলাটি খুলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি হইয়া গেল। পাশের বাড়ীর একটি ছেলে ফিরিতে দেরী করায় মার কাছে প্রহৃত হইল, শিস্ দেওয়া চুরুটমুখে ছেলেরা কলরব করিতে করিতে কোথায় চলিয়া গেল, ক্রমে কলকাতার অতি পরিচিত ঝি-কুল থালাচাপা ভাত লইয়া মন্থরগমনে 'কুলায়' ফিরিল—আলোক সামনেই মধুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—এসেছেন? 'আসে নি' শুনিয়া আবার জানেলায় গেল। বেচারা মধু অনেক কথা বলিতে আসিয়াছিল,

ক্ষুণ্ণমনে স্তব্ধ হইয়া রহিল। আরও ছ'বার বেচারা নিঃশব্দে আসিয়াছে, ফিরিয়াছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া মধু সরিয়া গেল—ছোট রাণী অনাহারে আছেন—এইটাই হইয়াছিল চিন্তা। নিজের জন্য সে ভাবে না, ছেলেবেলায় দেশে থাকিতেই সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পরমহংস হইয়াছে। বড় লোকের বাড়ী চাকুরী করিয়া সে মুরুব্বিদলের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে, আলোকের অনাহার যে আলোককেই পীড়া দিতেছে, অথচ একেবারে উদাসীন, দেখিয়া সে ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

একটু পরে আর একবার উঁকি দিয়া দেখিল, আলোকের কেবলমাত্র সোণা-মোড়া কবরীটিই নজরে পড়িল, জাগ্রত-না-নিদ্রিত তাও সঠিক ধারণা-করিতে পারিল না। হঠাৎ সে কাশিয়া ফেলিয়াছিল, ছোট রাণী যেমন ছিল, তেমনি রহিল, নড়িল না। মোটর গাড়ীর ভেঁপুর শব্দে সচকিত হইয়া সে সদরের দিকে চলিয়া গেল। এই গলিটায় সমস্তদিনের মধ্যে যা দুবার মোটর ঢুকিয়াছিল তাহাও এইখানেই আসিতে।

পতিত ভিতরে ঢুকিয়া সবিনয়ে কহিল—বাবু এসেছেন।

আলোক সাগ্রহে কহিল—এসেছেন! ডাকুন······

এখানে নয়, বাড়ীতে—শুনিয়াই আলোক বসিতে যাইতেছিল, সম্বরণ করিয়া বলিল—আমি যে বড় বিপদে পড়ে গেছি পতিত বাবু! আমার ভগ্নীপতি সেই ৯॥ টায় বেরিয়েছেন, এখন পর্য্যন্ত দেখা নেই······

মধু একটু সংশোধন করিয়া বলিল—একবার একটা দেড়টার সময় এসেছিলেন, বউ······

আলোক আরক্তমুখে জিজ্ঞাসিল—কখন্?

একটা-দেড়টা হ'বে তখন·········

কৈ-এতক্ষণ আমাকে বলিস্ নি ত ?

মধু ইতঃস্তত করিতেছিল, কিন্তু আলোক সেই অত্যল্পটুকু সময়ের মধ্যেই একেবারে অস্থির হইয়া বলিল—না-হয় একটার সময়ই এসেছিল, কিন্তু এত-যে রাত্রি হ'ল, এখনো মানুষের দেখা নেই······

পতিত মুখ ফিরাইয়া মধুকে জিজ্ঞাসিল—যখন এসেছিলেন, কোথায় যাচ্ছেন টাচ্ছেন কিছু বলে গেছলেন ?

মধু বলিল—না—টানিয়া টানিয়া আরো কি বলিতেছিল, আলোক তৎপূর্ব্বেই কহিল—পতিতবাবু, খোঁজ করা যায় কি ?

পতিত নতমুখে ভাবিয়া বলিল—একবার থানায় থানায় খবর নেব ?

আলোক জিজ্ঞাসিল—থানায় কেন ?

পতিতবাবু বিনীতকণ্ঠেই কহিল—আজ্ঞে, মাথাটা একটু খারাপ দেখেছিলুম কাল, যদি পুলিশের হাতে টাতে······

বাধা দিয়া আলোক বলিল—না, না, মাথা তাঁর একটুও খারাপ নয়, শোকে ঐরকম হয়েছিল, আজ সকালে এসে চমৎকার দেখেছিলুম।

পতিত ভাবিয়া অন্য কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারে নাই, কিন্তু-মিন্তু করিয়া কহিল—অন্য কোন উপায় দেখছি নে ত আমি।

এক কাজ করুন, বাড়ীতে খবর দিন, তিনি এসে পড়লেই সব বন্দোবস্ত হ'য়ে যাবে।

ছোটবাবুকে ?—উত্তর শুনিয়াও সে নড়িল না, একবার কি একটা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কথা কওয়ার প্রথম দিনেই কোন মতেই

যেন বলিতে না পারিয়া নতমুখ হইল। আলোক অধৈর্য্য হইয়া বলিল – দাঁড়াবেন না পতিত বাবু, আমি যে কিরকম ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি তার আর ঠিক নেই। আপনি শীঘ্র যান্।

পতিত বলিল—ছোটবাবুর শরীরটা আজ একটুও ভালো নেই…

চকিতে আলোক নীলবর্ণ হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। পতিত মুখও তুলিল না, কথাও বলিল না, তখন আলোক বলিল—কি হ'য়েছে কি, বলুন না ?

পতিত ঢোঁক গিলিয়া বলিল—ক্লাবে গেছলেন… …

তার হ'য়েচে কী ! যান্, খবর দিন্ গে। তাঁকে বিরক্ত করার জন্যে যদি আপনার অপরাধ হয়, আপনি আমার নাম করবেন। বিরক্ত হ'ন তিনি, আমি তার জবাব দেব। যান্ যান্…আপনি।

এ-জাতির পুরুষের কাছে মেমসাহেবের স্মরণ মাত্রে মাফ্ ! সে-অভয়বাণীর পর পতিতের বিন্দুমাত্র দ্বিধা রহিল না। সে ভোঁ ও-ও করিয়া গাড়ী ছুটাইয়া দিল।

মধুও বিশ্রামলালসায় পাশের ঘরটায় ঢুকিল, কেবলমাত্র আলোকই পদশক্তি হারাইয়া নিস্তেজের মত দাঁড়াইয়া রহিল। ও-বাড়ীর রাধা কেরোসিনের আলো হাতে টিপ আঁটা মুখখানি বাড়াইয়া জিজ্ঞাসিল—তাইত ভাই, কোথায় গেলেন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। দিদি বলছেন হেদোটায় একবার খোঁজ করতে। আপনার বাড়ীর ওঁরা এলে তাই বলবেন একবার।

আলোক বলিল—হেদোর পুকুরে ! রাত্রে কি সেখানে থাকতে

দেয়! বোধ হয় না, নটার পর সাধারণ সব পার্কই বন্ধ হয়ে যায় আমি জানি।

বধূটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তা বটে!

আলোক বলিল—দিদি কোথায়?

দালানে বসে আছেন বিণুকে নিয়ে! আমার ঐ ছেলেটি গলার মালা। তিনিই বলছিলেন অজয়বাবু রোজ আফিস থেকে ফিরে আপনার দিদির কাছে বল্‌তেন, কতক্ষণ হেদোয় ছিলেন। অজয়বাবু তাঁকে ছেলে বেলায় না-কি হেদোয় দেখেছিলেন ফ্রক্ পরে খেলা করতে, তাই জায়গাটা একটু……

আলোক কথাটা এইরূপে শেষ করিল যে তীর্থের মত হ'য়েছিল—কিন্তু আসল জিনিষটার শেষ এইখানেই হইল না। যে সামান্য ঘটনাটি সে কানে শুনিল কতই সহজ ছেলেমানুষির মত সে'টি—তবুও মন যেন কৃতজ্ঞ হইয়া মানিল, তাহাকে শোক লাগিবে না ত কাহার লাগিবে।

বধূটি হৃষ্টান্তঃকরণে কহিল—তিনদিন দিদির মৃত্যুর পর যা খাবার করে আমরা পাঠিয়েছি, চুলচেরা ভাগ রেখে দিয়ে তবে একটি গ্রাস মুখে দিয়েছেন। আমার দেওর প্রথম দিনটা বুঝতে পারে নি, তারপর পেরেছিল—ডাক্তারী পড়ছে, খুব কঠিন ছেলে, সে'ও এসে বলেছিল, হ্যাঁ পত্নীবিয়োগ বটে! শুনে আমরা ত কেঁদেই ফেলেছিলুম, দিদিই কেবল কাঁদেন নি। তাঁরও এই রকম হ'য়েছিল, দশ পনেরো দিন একেবারে উন্মাদ পাগল। উঠেছেন বসেছেন শুয়েছেন কিন্তু যেন কোনটাই করেন নি। চোখ চেয়ে থাক্‌তেন অথচ চোখে দেখতে পেতেন না। বল কি ভাই, উনিশ বছরে এই সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, আজ ঠিক

আট বছর, এই অঘ্রাণ মাসের ২৬শে বৃহস্পতিবার, রাত আট্‌টার সময়।

আলোক বাষ্পপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসিল—ওঁর নিজের ছেলেপুলে নেই ?

হয় নি ত ! দু'টি সতীন পো আছে, দু'টিই বিলেতে পড়ছে। ছেলেরাও যাবে না, বাপও ছাড়বে না। ছেলেরা বল্‌ত, 'বয়কট্ করব, বাপ বলতেন—তোদের ত আগে বয়কট করি, যা বেটারা বিলেত যা।'

কি করতেন তিনি ?

স্কুলের মাষ্টার ছিলেন—কৃষ্ণনগরে। এমনই বরাত শেষবেলা ছেলের হাতের আগুণটি পর্য্যন্ত পেলেন না। তারাও আর ফিরবে না বলেছে। সেখানেই কোন্ কালেজে বড়টি চাকরী নিয়েছে, ছোটটি ছবি আঁকে। দিদিকে দুশটাকা করে মাসে মাসে পাঠাত, আস্‌তে বল্লেই চিঠির জবাব পর্য্যন্ত বন্ধ। গত বছর থেকে দিদিও টাকা নেওয়া বন্ধ করেছেন। তিনি তাদের লিখেছিলেন. তোমরা আমার মাতৃত্ব স্বীকার করিলে আমার আদেশে ফিরিয়া আসিতে, তা যখন অগ্রাহ্য করিলে তোমাদের অর্থ সাহায্য ও আর আমি লইতে পারিব মা। তারাও আর খবরাখবর করে না।

আলোক ভালোমন্দ বিবেচনা না করিয়াই বলিয়া ফেলিল সেটা কি ভালো করেছেন ভাই ?

বধু বলিল—ঠিক জানি না, তবে দিদি করেছেন বলেই বল্‌তে পারি খারাপ কখনই তিনি করেন না।—বলিয়া বধূটি একবার পিছনে কি দেখিয়া লইল, আবার মুখ ফিরাইয়া কহিল—তাঁকে যে না চেনে, সে তাঁর কাজের ভালোমন্দ বুঝতে পারবে না।

এই ভক্ত রমণীর যুক্তির বিপক্ষে অনেক তর্ক মুখে উপস্থিত থাকিতেও আলোক নিস্তব্ধ রহিল। যাহার প্রসঙ্গ—জীবনে সে একটিবার তাঁহাকে চাক্ষুষ দেখিয়াছে,—কিন্তু সেই একবারের দেখাই যেন শত চক্ষে দেখিয়াছে, শতবারের দেখা একবারেই মিটাইয়া লইয়াছে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন সে রূপের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে।

রাধা, বিণু ঘুমিয়েছে ভাই—বলিতে বলিতে যিনি ঘরে ঢুকিলেন, আলোক সাগ্রহে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল—দিদি, কি উপায় করি বলুন।

আমার ছোট ভাই অনিলকে পাঠিয়েছি হেদোয়, সে ফিরে আসুক দেখি কি হয়।

এই সময়ে গলিতে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল, নিজের গাড়ীর হর্ণ হাজারের মধ্যেও চিনিতে পারা যায়, আলোক বলিয়া উঠিল—ওঁরাও এসে পড়েছেন।

পতিত ঢুকিয়া নিম্নস্বরে কহিল—বাবু উঠতে পারলেন না। শরীর বড়ই খারাপ।

আপনি বলেছেন তাঁকে ?

বলেছি, তিনি বল্লেন……

বোন্, অনিল-ও ত ফিরে এল, তিনি হেদোতেও নেই—বাষ্পপূর্ণ স্বরে এই কথাকয়টি বলিয়া বিধবা সরিয়া গেলেন।

ওদের বাড়ীর ক্ষুদ্র দীপটিই যেন এ-বাড়ী ও-বাড়ী আলো করিয়া রাখিয়াছিল, বধুটি আলো হাতে সরিয়া যাইতেই আলোকের মনে অন্ধকার মেঘের মত জমিয়া চাপিয়া ভারী হইয়া উঠিল। পতিতকে বাহিরে যাইতে বলিয়া সে সেইখানেই চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল।

নির্জ্জনে দুঃখের বোঝা বহিতে এতক্ষণ পাশের বাড়ীর দুইটি সহৃদয় রমণী তাহার সঙ্গী ছিল ভাবিয়াই সে কোন মতে সহ্য করিতে পারিয়াছিল, এক্ষণে তাহাদেরও দেখিতে পাইল না। রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে—সমস্ত পাড়াটা একেবারে নিস্তব্ধ, কোথাও এতটুকু শব্দও নাই—আলোকের যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছিল।

সে ভাবিল, পতিতকে ডাকাইয়া লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়—কিন্তু এ কথায় আর্ত্ত হৃদয় সায় দিল না। আবার ভাবিল, বধূটিকে ডাকিয়া লয় কিন্তু ইতঃস্তত করিতে লাগিল। তাহারা অজয়ের জন্য যথেষ্ট করিতেছে,—তবু ও-স্বামী পুত্র ফেলিয়া সমস্ত দিনের ক্লান্তি অবসাদের পর বিশ্রাম হইতে বঞ্চিত করিতে আলোকের নিজেরই সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল।

আলোক ভাবিতে লাগিল, সে ছেলে মানুষ, একলা এখানে এই রাত্রে কি করিয়া থাকিবে? তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে ভাবনায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। কোথায় খুট করিয়া একটু শব্দ শুনিলে তাহার হাত পা আড়ষ্ট হইয়া যায়। তাহার এই সবে মাত্র ষোড়শবর্ষ বয়স, চিরদিন সুখে ঐশর্য্যে সে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়াছে, আজ দুঃখের পীড়নে, নির্জ্জন, নিশীথে, নিজের অসহায় অবস্থা চক্ষে পড়িতেই সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখনি কণ্ঠরোধ করিয়া চুপ করিল, হায়! কাঁদিবারও যে উপায় নাই!

আজ সে প্রথম জীবনে ধিক্কার দিল, জীবনে কোন প্রয়োজন, কোন সুখ-সাধ বাকী আছে বলিয়া মনে হইল না। এমন কি, অতঃপর সে এই অন্ধকারে, এই ভাঙ্গা ঘরে সারাজীবন কাটাইয়া দিতে পারিবে এই

দুঃসাহসে মনে বল পাইয়া বার বার মধুকে ডাকিল; মধুর একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, কর্ত্রীর কোমল কণ্ঠ তাহাকে জাগাইতে পারিল না,—আলোক আবার ডাকিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই যে আসিয়া অন্ধকারে তাহার সুমুখে দাঁড়াইল. সে মধু নয়—আলোক আবেগভরে সেদিকে কয়েকপা অগ্রসর হইয়া, দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া পিছাইয়া গেল।

আগন্তুক সবিস্ময়ে কহিল আলোক, আমি অজয়।

আলোক নিস্পন্দ, নির্ব্বাক।

— ১৩ —

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আলোক দাঁড়াইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল—এ কি অত্যাচার আপনার? এতক্ষণ ছিলেন কোথায়?

অজয়ের মুখ মসীলিপ্ত হইয়া গেল, সে অতিকষ্টে বলিল—হেদোয়।

আলোক অধিকতর পরুষকণ্ঠে বলিল—এত রাত্রি পর্য্যন্ত হেদোয়?—তখনি কি একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, স্বর নম্র করিয়া কহিল—তা বলে যান্ নি কেন?

কা'কে বলে যাব?

আলোক জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—কা'কে বলে যাব? কেন আমরা কি মরে গেছি যে বলে গেলে শুনতে পেতুম না!

অজয় মুখ তুলিয়া চাহিল; কিন্তু আলোকের রক্তশূন্য শুষ্ক পাতার মত মুখখানি দেখিয়া তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে আবার মুখ নমিত করিয়া লইল।

আলোক বলিল—আমাদের বলে যাওয়া আপনি দরকার বোধ করেন নি, কিন্তু এই রাত্রি পর্য্যন্ত পথপানে চেয়ে থাকতে একলা আমিই—বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল।

অজয় এতই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে হঠাৎ থামিবার কারণ

একমাত্র ক্রোধই মনে করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। হতভাগিনী রমণী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া যে ক্রমাগত কান্না রোধ করিতেছিল সে তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। কৃত অপরাধের অনুশোচনায় মরিতে মরিতে বলিল—আমি যদি জানতুম আলোক যে তুমি আমার পথ চেয়ে এমনি করে বসে আছ, কি ছার হেদো!—আমি যে স্বর্গে যেতেও চাইতুম না।

আলোক ফিরিল না। অজয় বলিল যখন এসে দেখলুম তুমি নেই, বাড়ীর চৌকাঠ পার হয়ে ঢুকতেও আমার বুক ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হল—আমি পালিয়ে গেলুম। তুমি আমায় এমন মিথ্যে ভুলিয়ে গেলে কেন আলোক?

আলোক রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—মিথ্যে ভুলিয়ে গেলুম?

অজয় গদগদস্বরে বলিল—আমি ফিরে এসে তোমাকে দেখতে পাব—এ অভয় ত তুমিই আমাকে দিয়েছিলে আলো? কিন্তু ফিরে এসে আমি দেখলুম, তুমি চলে গেছ, তোমার চাকরই বল্লে তুমি বাড়ী গেছ! আর আমি ঢুকি নি। এ প্রতারণা কেন করলে আলোক?

প্রহৃত অশ্বের মত গ্রীবা উত্তোলন করিয়া আলোক বলিল—প্রতারণা?

অজয় শুষ্ক মুখে বলিল—ছেলে ভুলোনা নয় কি? আমি যে সারা পথ আশা করে আসছিলুম যে গিয়ে আমার কুমুকেই দেখতে পাব!—যে, আমার কুমুদ মরেনি, আমার ঘর উজ্জ্বল করে আছে। চিরদিন যেমন তার কোলের কাছে মাথা রেখে শুয়ে, তার মুখের পানে চেয়ে……
সহসা সে অগ্রসর হইয়া আলোকের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল -

আমার কথায় রাগ করো না আলো! আমি যে তোমাকে কুমুই ভাবি! জীবনে একা তাকেই দেখে এসেছি, তার মত তোমার কাছে যত্ন পেয়েছি, তোমাকে দেখেই আমি কুমুদের কথা ভুলতে পেরেছি। কাল থেকে সারাক্ষণ ভেবেছি আমার কুমু মরে নি, আলোক তুমিই আমার কুমুদ!

তাহার দীপ্তকণ্ঠের প্রবল উচ্ছ্বাসে আলোকের সমস্ত অন্তঃকরণ দুলিয়া উঠিল, সে হস্ত মুক্ত হইয়া একটু সরিয়া গেল। দোষস্খালনের চেষ্টার মত কম্পিত কণ্ঠে কহিল—আজ যে, শনিবার, সকাল-সকাল আফিসের ছুটি হয় সে আমার জানা ছিল না, থাকলে আমি যেতুম না।

অজয় সে কথায় কান না দিয়াই বলিল—বোধ হয় দেড়টার সময়ই এখানে এসেছিলুম। এখান থেকে পথে যেতে যেতে ভাবলুম একবার তোমার বাড়ী যাই কিন্তু সাহস হ'ল না।

সাহস হ'ল না! কেন শুনি?

বড় লোকের বাড়ী ঢুকতে কোন্ গরীবের সাহস হয় বল দেখি?

আপনার লোকের হয়, হয়ত! আমাকে যদি আপনার ভাবতেন, যেতে আপনার দ্বিধা হত না! বলিয়াই সে অজয়ের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছিল। অজয়ের বিবর্ণ মুখ দেখিল, শুনিল—ভগবান জানেন, কুমুদের চেয়ে আপনার জগতে কেউ ছিল না, আমি তোমাকে আমার কুমুই ভাবি আলোক! কিন্তু তোমার বাড়ীর সঙ্গে সে সম্পর্ক নয় ত! তারা যে স্পষ্টই বলে দিয়েছে, বারবার সেখানে ঢোকবার চেষ্টা করা আমার পক্ষে মূঢ়তা ছাড়া আর কিছুই নয়!

আলোক তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞাসিল—এ-কথা কে বলেছে আপনাকে?

যাঁর বাড়ী—তিনিই!

আলোক মরিয়ার মত চাহিয়া রহিল, আর একটা ক্ষুদ্র প্রশ্নও সে করিতে পারিল না।

অজয় বলিতে লাগিল—কেন, সে কথা কি তুমি জান্তে না? বাড়ীর দরওয়ানেরাও জান্‌ত! সেদিন যখন তোমাকে এই খবর দিতে গেছলুম তখনও দরওয়ান বল্‌ছিল—হুকুম নেই—তার পর কি জানি কেন, একটি ছোকরা এসে ডেকে নিয়ে গেল। কুমুদের মৃত্যু কালের অনুরোধ বলেই তাদের নিষেধ স্বত্বেও আবার সে-বাড়ীর ফটকে আমি ঢুকতে পেরেছিলুম।

আলোক কথা কহিবে কি! ভাঁটার মত একটা কি ক্রমাগত গলা ঠেলিয়া উঠিতেছিল। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বাষ্পাকুলনেত্রে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সহসা জিজ্ঞাসা করিল—দেড়টার সময় এখান থেকে গিয়ে কি করলেন?

এখান থেকে! সোজা এলগিন রোডে, হেঁটে; তোমার বাড়ীর সামনে দিয়ে। সেখান থেকে, হেদোয় গেলুম। বৈকালবেলা ছেলে মেয়ে দাসদাসী, যুবা-বৃদ্ধে ভরে গেল। ছেলেরা দুখানা ছোট নৌকায় চড়ে পুকুর তোলপাড় করতে লাগল, ছোট ছেলেরা দোলায় চড়ে হৈ চৈ বাঁধিয়ে দিলে, ক্রমেক্রমে সব একেবারে নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল, কেউ কোথাও নেই। দরওয়ান আমাকেও তাড়িয়ে দিলে! কিন্তু আমি কোথায় যাব! আমার গৃহ যে জন্মের মত অন্ধকার করে আমার কুমুদ চলে গেছে, আমার পক্ষে কলকাতার লোকবিরল রাজপথও যা ঘরও তাই। এসে কারো মুখের,

সে হাসিটি দেখ্‌তে পাব না, কারো মুখের মিষ্টি কথাও শুন্‌তে পাব না —আমি ফের বেড়া ডিঙ্গিয়ে হেদোর বেঞ্চির'পরে শুয়ে পড়লুম। মাথার উপর অগণিত নক্ষত্র আমাকে দেখ্‌ছিল ক্রমে তারাও নিস্তেজ হয়ে গেল, চাঁদ উঠ্‌ল, চাঁদেরও সে হাসি নেই, যেন কার শোকে ম্লানমুখে নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধেই দেখা দিয়েছেন!

আলোক বলিল—তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন?

অজয় বলিল না। হঠাৎ চাঁদের শোভা শতগুণ বৃদ্ধি পেল, পুকুরের জল যেন প্রভাতরৌদ্র বর্ষার ক্ষেত্রের মত ঝিক্‌মিক্ করতে লাগ্‌ল, মেয়ে স্কুল-টার ছাদের ওপর থেকে একঝাঁক কাক হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে আমাকেই আঁ আঁ বলে ডেকে নিয়ে এল। বল ত আলোক কেন চাঁদ হেসেছিল, কেন পাখীরা আমাকে ডেকেছিল? বোধ করি তারা তোমার আগমন জান্‌তে পেরেছিল। এই চাঁদই ত সেই চাঁদ, তোমার চাঁদমুখ দেখে গিয়েই…

আলোক কঠিন হইয়া বলিল—যেটুকু রাত আছে বকে বকেই কাটাবেন?

অজয় সেইখানে বসিয়া পড়িয়া বলিল—তুমি যা বলবে তাই করব।—তাহারই অনুমতি চাহিয়া তাহার মুখে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া চাহিয়া রহিল।

আলোক বিরক্ত হইয়া বলিল আমি জানিনে, যান্। ইচ্ছে হয় বসেই থাকুন!

—বলিয়া আলোক ত্বরিত গমনে কোথায় যাইতেছিল, অজয় সামনে দাঁড়াইয়া আর্ত্তস্বরে কহিল—তুমি কোথায় যাচ্ছ আলো!

আলোক স্খলিতকণ্ঠে বলিল—আমিও সারারাত আপনার কাছে পাগলের মত বসে থাকি, এই কি আপনি চান?

শুধু ঐ কথাটি জিজ্ঞাসা কর' না আলোক আমি কি চাই? আর সব বল—ঐটি বল না।

তা না হয় না বল্লুম, কিন্তু খাওয়া দাওয়ার ত সময় নেই, সমস্ত দিনের পর একটু শুলে ক্ষতি কি?

অজয় কোন কথা কহিল না, ঠিক তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে ভূতলে বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসিল—রাত কত বল্‌তে পারো?

ও-ঘরে ঘড়ি আছে, দেখে আস্‌ছি।—বলিয়া আলোক বাহির হইয়া গেল। মৃদু আলোকেও ঘড়ি দেখার কোনই কষ্ট হইল না, কিন্তু যে ঘড়িটা তখনও তিন ঘণ্টা রাত নিরূপণ করিয়াছিল, তাহার দিক হইতে অনেকক্ষণ সে চোখ্ ফিরাইতে পারিল না। এই নিঃসঙ্গ ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে যে আরো তিন ঘণ্টা থাকিতে হইবে জানিয়াই সে-যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল।

কিন্তু হায়! সংসারে সকলকে ফাঁকি দেওয়া সহজে হইতেও পারে, নিজের মনকে ফাঁকা চলে না। অল্পক্ষণ পরেই সে দুহাত বুকের উপরে জোড় করিয়া আকুল প্রার্থনা করিতে লাগিল—এ কি নিদারুণ বিপদে সে পড়িয়াছে, এবং কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাইবে!

এমন বিপদেও মানুষ কখনও কখনও পড়ে, কেবলমাত্র নিজের মানসিক বলে তাহার সন্নিকট হইতে দূরে পলাইলেই নিস্তার আছে জানিয়াও সমস্ত দেহমন যে চুম্বকের মত সেইখানেই আকৃষ্ট আবদ্ধ থাকিয়া ক্রমাগত গভীর হইতে গভীরতর কূপে নিমগ্ন হয়, এ বিশ্বাস হয়ত সকলের নাই, আলোকেরও ছিল না। যে মুহূর্ত্তে তাহার মন এই পথের

সন্ধান জানিতে পারিল, সেই মুহূর্ত্তেই বাঁকিয়া বসিল! এমন করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিতে সে চাহে না। ঘড়িটা তখনও টিক্ টিক্ করিয়া করিয়া নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছিল, আলোক সেই দু'টি কাঁটার পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, সময়টা আরো দীর্ঘ হইলে সে ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন-না-কোন উপায় বাহির করিতে পারিত, কিন্তু এতই অল্প, এতই অল্প যে তাহারও আশা নাই।

অসুস্থ মস্তিষ্ক কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না এবং এমনি তাহার স্বভাব যে কোথাকার কতরকমের চিন্তা জড়ীভূত হইয়া একটির পর একটি সেই দুর্ব্বল মস্তিষ্কের উপরই প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। আলোকের মনে পড়িয়া গেল, আর একটা সংবাদ সে পাইয়াছে যাহাকে একমুহূর্ত্ত সময় অবহেলা করা তাহার একান্ত কর্ত্তব্য! যদিও স্বামীর অসুস্থতা কি এবং তদবস্থায় সে কোন উপকারেই লাগিবে না জানিলেও তাহার মন তাহাকে সেই শয্যার পার্শ্বেই অসাম বলে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া ফেলিতে লাগিল।

এ-ঘরে আসিতেই দেখিল, অজয় ভূতলে শুইয়া আছে, কক্ষের মৃদু আলোকে সে জাগিয়া আছে কিম্বা নিদ্রিত ঠিক বুঝিতে না পারিয়া অতি সন্নিকটে আসিয়া নত হইতেই অজয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—রাত কি অনেক আছে আলোক?

আলোক উত্তর দিতে যাইবে, অজয় আবার বলিল—তাই বুঝি পালিয়েছিলে?

কথাটা এমনি উত্তপ্ত জ্বালার মত আলোকের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিল যে একমুহূর্ত্তে তাহার সারা হৃদয়খানি অভিমানে উদ্বেল হইয়া উঠিল, সে

আরক্তমুখে তপ্তস্বরে বলিয়া উঠিল—তাই যদি পালিয়েই থাকি অন্যায়টা কি হ'য়েছি শুনি? আমি কিছু চিরকাল দিনরাত্রি আপনাকে আগ্‌লে থাক্‌তে পারব না! আর না পারলে, খুব অন্যায় করেছি বলে কেউ আমাকে দোষ দিতেও পারবে না।

অজয় সাড়া দিল না। তাহার চোখের তারা স্থির হইয়া গেল, শোকার্ত্ত মুখের কুঞ্চিত রেখাগুলি যেন আঘাতিত হইয়া ফুলিয়া উঠিল—কিন্তু আর একজন যে প্রদীপ্তনেত্রে তাহারই পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে সে এ সকলের কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে যাহা করিয়াছে এবং করিতেছে তাহাই এত যথেষ্ট, প্রচুর যে তাহার পরে আর কোন অভিযোগ যে কেহ দিতে পারে এ-ই স্বপ্নাতীত, তাই কথাটায় যতখানি জ্বালা ছিল, মনের গরম বাতাসে আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আলোক দৃপ্তস্বরে বলিল—উপকারের প্রত্যুপকার অনেকের হয়ত শক্তি বা সামর্থ্যে কুলায় না,—তাই বলে মানুষ যে এতো অকৃতজ্ঞ হ'তে পারে সে আমার জানা ছিল না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি এইটেই স্বাভাবিক। এবং সে ঔদার্য্য যাদের নেই তাদেরই……

হঠাৎ তাহাকে থামিতে দেখিয়া অজয় বিস্মিত হইয়া বলিল—তারাই ইতর, কি বল এইত?

আমার বলাবলিতে কিছু আসে যায় না, সে নিশ্চয়, কিন্তু সত্যি একটা জিনিষ আছে যা কোনদিন না কোনদিন যে কোন ফাঁকে হো'ক তা বেরিয়ে পড়েই। এর ব্যতিক্রম ভূভারতে আছে বলে অন্ততঃ আমার ত মনে হয় না। তা বেশ, আপনি আমার ভারি উপকার করেছেন। আমি কারু কথা বিশ্বাস করি নি, এমন কি স্বামীর কথাও না—তার কথাও

হেসে উড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু তাঁদেব কথাই সত্য, সত্য. একান্ত সত্য!… বলিয়াই সে দুপ্ দুপ্ করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, অজয় দ্রুতপদে তাহার সম্মুখীন হইয়া দু'হাতে পথ আগুলিয়া বলিল—যেও, তোমাকে বাধা দেওয়ার শক্তি আমার নেই, কিন্তু একটি কথা বলে যাও—কি এমন অবিশ্বাস করেছিলে যার জন্য হঠাৎ এত অনুতাপে হৃদয় মন তোমার ভরে গেল! না বল্লে যেতে দেব না, এ আমি বলে রাখছি।

আলোক একমুহূর্ত্তের জন্য ভয় পাইয়াছিল, তখনই আত্মসংযম করিয়া কহিল—আপনাদের ও আমাদের পার্থক্য স্বভাবগত, মানুষের কৃত নয়—কোনদিনই এ কথা আমার বিশ্বাস হত না—আমি ভাবতুম মানুষই এমন করেছে, কিন্তু আমার সে ভুল ধারণা আপনিই ভেঙ্গে দিয়েছেন — তার জন্যে আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ! নৈলে যত এরাতে আমার আরো কত দুঃখ লেখা ছিল!

দুইমুহূর্ত্ত বিস্ফারিত লোচনে আলোকের রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অজয় বলিল—দাঁড়াও। তোমাদের—আমাদের পার্থক্য মানে! ধনী ও দারিদ্রে—এই ত! বুঝেছি—যাও—বলিয়া সে হাত সরাইয়া লইল. আলোক দরজা পার হইয়া গেল।

মধু পণ্ডিতকে গাড়ী দরজায় লাগাইতে বলিল. আলোক পা বাড়াইবে, অজয় কাতরকণ্ঠে কহিল—যাও, আর কোনদিন হয়ত এ বাড়ীতে পা'ও তোমাকে দিতে হবে না, তবু যে ধারণা তোমার অভ্রান্ত বলেই বুঝে যাচ্ছ তা যে কত ভ্রান্ত কত মিথ্যা তা সেদিন বুঝবে আমার একান্ত অনুরোধ সে দিন এই দীনহীনের সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করে মুক্তি দিও।

—সে ভিতরে চলিয়া গেল; অসতর্ক একটি লোককে সাবধান করিতে পতিত মোটরের শিঙা বাজাইতেই আলোক দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

সশস্ত্র চোরের সাড়া পাইয়া, নিদ্রাভঙ্গে গৃহস্থ যেমন সন্তর্পনে পা ফেলিয়া সরিয়া যায়, গৃহদ্বারে পৌঁছিতেই ভৃত্যের মুখে স্বামীর সংবাদ শুনিয়াও আলোকের বুক চোরভয়ে ভীত গৃহস্থের মতই ধড়াস্ ধড়াস করিতে লাগিল। অলস শ্রান্ত চরণে নিজের ঘরের বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গাত্র বস্ত্র খুলিবে কি তাহার হাত পায়ের বল নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। একী চেহারা হইয়া গিয়াছে। কে-যেন রাজ্যের কালী তাহার মুখে চোখে হাত দু'টিতে পর্য্যন্ত ঢালিয়া লেপিয়া—মুছিয়া দিয়া গেছে। সে কালী সাবানে উঠে না, ধুইলে তাহার বর্ণ বিবর্ণ হয় না—এমনই করিয়া মিশাইয়া দিয়া গেছে! সারারাত্রি জাগরণের অবসাদ অথবা আর কিছু—আলোক বারবার নিজেকেই প্রশ্ন করিয়া—সদুত্তর না পাইয়া মুকুরের সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে পথ পাইল না।

বড়রাণী সবেমাত্র শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন, চোখ'-চোথী হইবামাত্র বলিয়া উঠিলেন—এই এলি আলোক?

মাথা নাড়িয়া আলোক বড়রাণীর নিকটে আসিয়া নতমুখে দাঁড়াইতেই তিনি সস্নেহে কহিলেন—কি'রে আলোক, কি হয়েছে? মুখ-চোখ এত শুকিয়া গেছে! তোর ভগ্নীপতি ভালো আছেন?

আলোক মৃদুকণ্ঠে কহিল—তুমি কি কিছুই শোননি দিদি?

বড়রাণী বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন—কি শুনব? কৈ কিছুই ত শুনি নি!

আলোক বলিল—কাল সমস্তদিন রাত বাড়ীই আসেন নি—এই ভোর বেলা এলেন—আমিও তখন আসছি।

বড়রাণী বলিলেন—তুই ত কাল দুপুর বেলা বললি -ভালো আছে, আফিস গেল—তার পরে এত কাণ্ড। তাহ'লে মাথাটার একটু গোলমাল হ'য়েছে কি বলিস্। আফিস্ থেকে আর ফেরে নি ?

ফিরেছিলেন। ফিরে হেদোয় এসে শুয়েছিলেন। দিদিকে ছেলে-বেলায় হেদোয় খেলা করতে দেখেছিলেন সেই থেকে হেদো তাঁর অত্যন্ত প্রিয়স্থান। কথা কয়টি বলিতে বলিতে, হঠাৎ অজয়ের সেই কথা কয়টা ছুটন্ত রেলগাড়ীর পার্শ্বস্থিত টেলিগ্রাফ পোষ্টের মত চট্ চট্ দৌড়াইয়া গেল। সে যে মধ্যাহ্নে আফিস ফেরৎ বাড়ীই আসিয়াছিল, তাহার অদর্শনেই গৃহপ্রবেশ করে নাই এ হেন লজ্জার কথাটা বেশীক্ষণ মনে স্থান দিল না।

পুনরায় বলিল - রাত্রে পণ্ডিত বাবুকে আমি এখানে পাঠিয়েছিলুম খবর দিতে।

আমাকে! কৈ কিছুই বলেনি ত! ওরে হরে, মোটরবাবুকে ডাক্ ত।

তোমাকে খবর দিতে পাঠাইনি বটে, তবে তোমাকে যে কেউ বল্‌বে না, এ আমি জানতুম না।

তাহ'লেই হ'য়েছে। এবাড়ীর লোক-তোমার বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করবে, এমন লোকই সব নয়। হা আমার বরাত! খবর পেলে আমি কি নিশ্চিন্ত থাকি! ঠাকুরপো ভালো ছিল না, তোর ভাসুরকে

পাঠাতুম না ! আহা ! ছেলেমানুষ, সমস্ত রাত ভাবনায় ভয়ে শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে। যা যা, আর বসিস নে, একেবারে স্নান সেরে একটু চা'টা খেয়ে নে। যা, আবার বসে !

আলোক উঠিল না, বলিল—একা ঐ মধু চাকর আর আমি ! দিদি······

বড়রাণী বাধা দিয়া বলিলেন—হ'বে না ! কি বলিস্ আলো। ভাবনা হ'বে না ! যাক্ ভালোয় ভালোয় যে ফিরে এসেছেন সেই ঢের। তা আজ কাউকে রেখে এসেছিস্ ত সেখানে ? খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা হ'চ্ছে ?

সে সকল বন্দোবস্ত আছে, মধু বামুনঠাকুরকে সেখানে রাখিয়া আসিয়াছে জানিয়া বড়রাণী বলিলেন—তাহ'লেও একবার যাস্ খাওয়া দাওয়ার সময়। নৈলে যে রকম হ'য়ে আছে মানুষটা খাবে কি-না তাই বা কে জান !

আলোক বলিতে গেল, পাশের বাড়ীর সেই দিদির যত্ন সেবা আত্মীয়তার কথা, কিন্তু ঠোঁটে বাধিয়া গেল। এমন সময়ে সে তাহার আত্মীয় থাকিতে কেবল মাত্র প্রতিবেশীর হাতে তাহার ভারার্পণ করাটা যেন কেমন কেমন ঠেকে বলিয়া কোনমতেই কথাটি বলিতে পারিল না।

তাহাকে ইতঃস্তত করিতে দেখিয়া বড়রাণী ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন—ইচ্ছে না থাকে যাস্‌নে, কিন্তু এই রকম করাকেই করা বলে ! আর স্বর্গ থেকে সতীলক্ষ্মী দিদি তোর কত আশীর্ব্বাদ যে করছেন, তার আর ঠিক নেই।······একমিনিট পরে পুনশ্চ কহিলেন—কিন্তু থাক্ সে সব

পরে হ'বেখন। যা ভাই এখন চট্ করে স্নানটা সেরে আয়,—আমি চা করিয়ে রাখি।

আলোক গমনোদ্যত হইয়াছিল, তন্মুহূর্ত্তে ফিরিয়া কহিল—কিন্তু লোকে কি বল্‌বে?

বড়রাণী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—কিসের কি বল্‌বে?

আলোক কম্পিতকণ্ঠে কহিল—এই ধর—যদি আমি না যাই, যদি তাঁকে না-দেখি না-শুনি?

বড়রাণী বলিলেন—তা হয়ত পাঁচজনে পাঁচ কথা বল্‌বে। লোকের বলাবলির ভয়ে ত আমরা মরেই গেলুম আর কী!

আলোক ব্যথাক্ষুব্ধ মুখে চলিয়া গেল। বড়রাণী বলিলেন—দেরী করিস্ নে ভাই, চা তৈরী করে আমি তোর জন্যে বসে থাক্‌ব।

আলোক স্নান সারিয়া বড়রাণীর কাছে বসিয়া চা পান করিল, কিন্তু আর কোন কথাই হইল না।

ঘণ্টাখানেক বাদে আলোক সুরেনের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, কতকগুলি কাগজপত্র খুলিয়া দুই করতলে মাথা চাপিয়া ধরিয়া সুরেন বসিয়া আছে। এতই নিবিষ্টচিত্ত যে আলোকের পদশব্দ তাহার কানে পৌঁছিল না, আলোক অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই সুরেন চমকিয়া উঠিল, কিন্তু কথা কহিল না।

আলোক জিজ্ঞাসিল—কেমন আছ এখন?

সুরেন শুষ্কস্বরে কহিল—ভালো। তুমি কাল কোথা ছিলে, আলো? কতবার যে তোমায় ডেকেছি তার ঠিক নেই। ঘুমিয়েছিলে? আমিও তাই ভেবে আর বিরক্ত করি নি।

শুষ্কপত্রের মত আলোকের সমস্ত মুখ একেবারে সাদা হইয়া গেল। কথা কহিবার চেষ্টা করিতেই সুরেন ম্লানমুখে বলিয়া উঠিল—কি কষ্ট পেয়েছি যে সারারাত্রি তা আমিই জানি! সব চেয়ে বেশী কষ্ট এই গেছে যে তুমি একটিবারও দেখ্‌তে এলে না! একবার খবর পর্য্যন্ত দিলে না। শেষে হতাশ হ'য়ে হু'হাতে বুক চেপে কেবল কেঁদেছি, কেবল কেঁদেছি!

কণ্ঠমধ্যে অশ্রুউৎস যেন গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছিল, তাহারই প্রবল বেগে আলোকের কথা কহিবার শক্তি ছিল না। সে কোনমতে টেবিলের কোণটা চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেন ব্লটিংপ্যাডের উপর হইতে রুমাল তুলিয়া বারদুই মুখচোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল—কেবলই ভেবেছি আমি মাতাল, তাই আলোক আমার কাছে এল না। কোন্ মাতালের উপর তার স্ত্রীর শ্রদ্ধা থাকে আলোকেরই বা কেন থাকবে? সে'ও আমার মুখদর্শন করবে না। আবার ভেবেছি, আমি মাতাল কিসে? আমার বিয়ের পর থেকে সমস্ত আমার মনে আছে, কেবল আর একটি দিন আমি ক্লাব থেকে অচৈতন্য অবস্থায় ফিরেছিলুম। তখন তুমি আরো ছোট ছিলে, তবু আমাকে বকেছিলে। সেই থেকে আর কোনদিন দেখেছ?

আলোক রুদ্ধশ্বাসে কহিল—আবার কাল খেলে কেন?

সুরেন সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল—সারারাত কি যন্ত্রণা যে ভোগ করেছি একবার যদি দেখ্‌তে তুমি!······আলোক এ কি এত বড় অপরাধ যে মৃত্যু হ'ত যদি আমার, তবুও মদ খেয়েছি বলে কাছে আস্‌তে

আলোক কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল, স্বামীর চরণ ধরিয়া বলিল—তোমার অপরাধ নেই, অপরাধ আমার। এই তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, তুমি কিছু দোষ করনি।

সুরেন নত হইয়া আলোকের হাত দু'টি ছাড়াইয়া দিয়া বলিল—তবে একবার এলে না কেন? এ ঘর তোমার ঘর বেশী তফাৎ ত নয়। এত যে আলোক, আলোক করে ডেকেছি, এত যে যন্ত্রণায় চীৎকার করেছি, তুমি কি কিছুই শুন্তে পাওনি?

আলোক নতমুখেই বলিল—না। শুন্তে পেলে এত স্পর্দ্ধা কখনই ছিল না যে তোমার আহ্বান উপেক্ষা কর্‌তে পারি।

সুরেন আর কিছুই বলিল না। কাগজ পেন্সিলে কি হিজি-বিজি কাটিতেছিল, আর পায়ের তলায় বসিয়া ভূতলে পতিত নিজের চোখের জলের ধারার দাগ কাটিতে কাটিতে আলোক বলিল—এখন আর কোন কষ্ট নেই ত? থাক্ না-সকালেই আবার ও-সব নিয়ে বসেছ কেন?

এগুলো বড় দরকারী—বলিয়া সুরেন কাগজে মন দিল।

আলোক মরমে মরিয়া যাইতেছিল, কেন সে প্রথমেই কালরাত্রে সুরেনের অসুখের সময়ে অনুপস্থিতির কারণটা বলিয়া ফেলে নাই। যে প্রসঙ্গটা একেবারেই চাপা পড়িয়া গেছে এখন আবার তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। অথচ সেই কথাটা কাঁটার মত ফুটিয়া খচ্ খচ্ করিতেছিল। স্বামী যে তাহাকে ভুল বুঝিয়াছেন, সেই ভুলের বশেই সারারাত্রি অসুখের যন্ত্রণার সঙ্গে এই বেদনাতেই কষ্ট পাইয়াছেন প্রথমেই যদি সে কথাটা বলিয়া ফেলিতে পারিত নিজেও

স্বস্তি পাইত, গোপনতার গুরুভার বহিয়া তাহার হৃদয় এত কাতর হইত না।

অনেকক্ষণ পরে সুরেনের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—অজয় বাবুর কথা শুনেছ!

কি বল ত? বলিয়া সুরেন মুখ না তুলিয়াই কাগজ দেখিতে লাগিল।

স্বামীর বিন্দুমাত্র উৎসাহ নাই জানিয়া কথাটা যেমন ভাবে বলিবার ইচ্ছা করিয়াছিল তাহা আর হইল না, একনিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—কাল আর সারারাত বাড়ীই ফিরলেন না।

সুরেন বলিল—তুমি সেখানেই ছিলে না কি? এবার সে মুখ তুলিল। যেন একস্-রে-র্ আলো ফেলিয়া আলোকের গলার তলটা অবধি পরীক্ষা করিয়া লইল।

আলোক বলিল—কি করে আর আসি! লোকটা সারারাত কোথায় পড়ে রইল……

মধ্য পথে 'ওঃ' বলিয়া -সুরেন একবার এদিকে চাহিল, কি যেন বলিবার ছিল, না বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল।

রাত তিনটের পর বাড়ী ঢুক্‌লেন। সকাল ন'টায় বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন, আফিস্ যেতে।

হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে বটে, পতিত একবার এই রকম কি একটা যেন বলেছিল।

কথাটা শুনিয়া আলোক আড়ষ্ট হইয়া গেল। মদের নেশায় মানুষ পুত্রশোকও ভুলিতে পারে, কিন্তু নেশা কাটিলে শোক আরও প্রবল হইয়া উঠে, নেশায় বিস্মৃতি আনিয়া দিতে পারে না, কেবলমাত্র চাপা দিয়া

রাখে। পতিত সংবাদ দিয়াছিল, ইহা সুরেন বিস্মৃত হয় নাই—কিন্তু পতিত ফিরিয়া গিয়া তাহাকে কি বলিয়াছিল, যদি সুরেন তাহাই জিজ্ঞাসা করে, আলোকের মুখচোখ ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

কিন্তু সুরেন অন্যমনস্ক ভাবে একটা কাগজ কেবলি এপিঠ ওপিঠ করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে আলোকের দিকে ফিরিয়া মৃদুস্বরে কহিল—আমি—আমাকে আজই দিল্লী যেতে হ'চ্ছে আলোক।

আলোক দাঁড়াইয়া উঠিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল · আমিও যাব।

সুরেন অবিচলিত সহজ কণ্ঠেই কহিল—যাবে? বেশ, পাঞ্জাব মেলে যাওয়া যাবে, ৮-৩০ মিনিটে।—বলিয়া সে কাগজে মন দিল। এ সম্বন্ধে বলিবার যেন আর কিছু নাই, সব বলিয়া চুকিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গেছে এমনি ভাবে সে কাগজ পড়িতে লাগিল। কিন্তু আলোকের জানিয়া লইবার অনেক ছিল, সে নিষ্কৃতি দিতে পারিল না, কহিল—কবে ফিরবে?

তা কি জানি! বলিয়া সুরেন কাগজে চোখ দিবে, হাতটা চাপিয়া ধরিয়া আলোক কম্পিত কণ্ঠে কহিল—আমাকে নিয়ে যেতে কি তোমার ইচ্ছে নেই?

সুরেন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল—সে কি কথা! আমার ইচ্ছে থাকবে না কেন? আমি ভাবছিলুম তোমারই বুঝি যাবার ইচ্ছে নেই।

আলোকের আরক্ত মুখের অধরে যে প্রশ্নটা উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল, কোনমতেই সে তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না। পঙ্কিল পথে পড়িয়া জোর করা যেমন কোনমতেই শোভা পায় না—তেমনি যেন কিসের ভয়ে সে কথাটা বলিতে গিয়াও সম্বরণ করিয়া লইল।

সুরেন জের টানিয়া বলিল—তুমি কোনদিনই ও-সব লাট-বেলাট পছন্দ কর না, তার ওপর মেড়োর দেশে যেতে হয় ত ইচ্ছে নেই এই ভেবেই·· ···

আলোক বলিল—সেদিন যখন প্রস্তাব করেছিলে তখন কি এ-সব ভাবনি ?

সুরেন ধীরস্বরে কহিল—যদি বলি, এখন যা ভাবছি তার অনেক কথাই তখন ভাবি নি ?

পলকে আলোকের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, সে উগ্রস্বরে কহিল—কি ভাবনি, সেইটেই আমি শুনতে চাই !

সুরেন দুইতিন মুহূর্ত্ত আলোকের ক্রোধরক্তিম মুখের পানে চাহিয়া তার পর সহাস্যে কহিল—তখন ভেবেছিলুম সিমলে যাব ।

আলোক লজ্জানত ক্ষুদ্র মুখখানি কিছুতেই সোজা করিয়া তুলিতে পারিল না। কেবলমাত্র অস্পষ্টকণ্ঠে কহিল—তোমার সঙ্গে যেতেই আমার ইচ্ছে, তারপর······

বাধা দিয়া সুরেন কহিল—আর 'তারপর' বলে কিছু নেই। তোমার কোন্ ইচ্ছা কবে অপূর্ণ আছে আলোক! কিন্তু—ওকি! কাঁদছ না-কি! কাঁদছ কেন?—সে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

আফিস্-ঘরে সাধারণতঃ লোকজনের অবাধ প্রবেশাধিকার আছে এই ভাবিয়া সুরেন দু'হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া পাশের ঘরটিতে লইয়া চলিয়া গেল।

—১৪—

একটা চামড়ার পোর্টম্যাণ্টে নিজের কাপড় চোপড়গুলা গুছাইয়া তুলিতেছে, মধু শুষ্কমুখে দ্বারের পাশ হইতে ডাকিল—ছোট মা!—আলোক উৎকর্ণ হইয়া বলিল—কেন রে মধু?

কেবল মধুর মুখ দেখিয়া আলোকের মুখের রক্ত যেন সাদা হইয়া গেল, কোন কথা না বলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মধু একমিনিট নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া, বলিল—বাবু এখনও ফেরেন নি, মা।

যে মুখ তাহার শুষ্কতায় সাদা হইতে সুরু করিয়াছিল, এই কথার পরে একেবারে মৃতের মত বর্ণহীন হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আলোক ভগ্নস্বরে বলিল - কে ফেরেন নি রে? জামাইবাবু?

হ্যাঁ মা।—বলিয়া মধু আলোকের মুখের পানে চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল।

আলোক কক্ষ বিলম্বিত ঘড়িটার পানে চোখ রাখিয়া কহিল—এখনি কি আফিস থেকে ফেরবার সময় হ'য়েছে রে?

মধু বলিল—আজ যে রবিবার, ছোটমা, আফিস ত নেই।

কথন্ বেরিয়েছিলেন?

সেই ভোরে। আপনিও মটর চড়ে এলেন, বাবু ও—জামাইবাবুও বেরিয়ে পড়লেন। আমি কত জিজ্ঞ্যেসন্থু, তা এক ধমক্ দিয়ে চলে গেলেন।

আলোক আর কথা কহিতে পারিল না। চতুর্দ্দিক নিক্ষিপ্ত জামা কাপড়গুলি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

মধু বলিতে লাগিল—পাশের বাড়ীর ওনাদের বল্লুম তা ওনারাও ত কিছু করতে পারলেন না।

আলোক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল—তাই বুঝি এত সকাল সকাল খবর দিতে এলি?

মধু বিনীতকণ্ঠে কহিল, সে বারোটার সময় বামুনঠাকুরকে পাঠাইয়া দিয়াছিল, ছোটরাণীর দেখা না পাইয়া সে ফিরিয়া গিয়াছিল, বলিয়াছিল ছোটরাণী বাবুর সঙ্গে মটর চড়ে বেরিয়েছেন।

মধ্যাহ্নে একবার আলোক বাজারে বাহির হইয়াছিল, তা'ও ঘণ্টাখানেকের জন্য! সে হতভাগা ঠাকুর অপেক্ষা করিল না কেন? অপেক্ষাই যদি না করিতে পারিল আর কাহাকেও বলিয়া গেল না কেন?—এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে সে অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু বিষম ক্রোধে মানুষের বাক্‌রোধ হয়, আলোকও সহসা কিছুই বলিতে পারিল না—ঠিক সেই সময়েই মধু কাতরকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কি করব মা?

জানি নে, দূরহ—বলিয়া আলোক তাহাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দ্বারনির্দ্দেশ করিল।

মধু সরিয়া দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া ভয়ে ভয়ে আর একবার জিজ্ঞাসিল—সেখানেই যাব মা?

ফের কথা বলছিস্—বলিয়া ফিরিয়া চাহিতেই মধু বাহির হইয়া গেল। তাহার পদশব্দ সিঁড়িতে লুপ্ত হইতেই আলোকের মনে হইল, হঠাৎ এত রুক্ষ হওয়া কোনমতেই তাহার উচিৎ হয় নাই এবং এই নির্দ্দোষী বৃদ্ধকে কটু কহিয়া বিদায় দেওয়া আরো অন্যায় হইয়াছে।

তাহাকে পুনরাহ্বান করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা স্বত্বেও কেন যে-সে পারিল না কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছে না—সুরেন ঘরে ঢুকিয়া বলিল—তোমার একাউন্টে টাকা আছে? একখানা চেক্ দাও ত পাঁচ্ শ টাকার, নরেশ ঘোষকে দিয়ে যেতে হ'বে। আমি ফিরে এসেই ট্রান্সফার করে দেব—আবার।

এই তুচ্ছ কথায় আলোক একেবারে আগুন হইয়া বলিল—কেন, তোমার একাউন্টে টাকা নেই?

সুরেন নির্ব্বাক বিস্ময়ে দু'মিনিট চাহিয়া থাকিয়া বলিল—থাকবে না কেন—আছে! কিন্তু চেক্ আমি কাটব না—কোন কারনে! আচ্ছা থাক্—আমি বৌদির কাছে নিচ্ছি—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। পাঁচ মিনিট পরে লালরঙের চেক্ হাতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আমি চেক্ দিলে 'ম্যাল-প্রাকটিস্' আইনে পড়ে—এ আরো ভালোই হ'ল, বৌ-দির চেক্ পাওয়া গেছে!

এতে 'ম্যাল-প্রাকটিস্' হবে না?

না। আমি ত আর কাটছিনে। মনোরমা রায় কে-না-কে!

বা রে আইন!

সবই ত তাই। নিয়ম হ'য়েছে ভোটারদের কাউকে ভাড়াগাড়ী কি ট্যাক্সী চড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে না ভোট দিতে, তবে মোটর চড়িয়ে

নিয়ে যাও আপত্তি নেই। পান চুরুট অবধি খেতে দিতে পারবে না, তবে পেলিটিতে ডিনার দাও, ক্ষতি নেই। সেদিন বলি নি তোমাকে, কেষ্ট সিঙ্গী বেঁসো মাড়োয়ারীর সঙ্গে মিলে একশ' মোটর জোগাড় করেছে, ভোটারদের বাড়ী থেকে খপ্ খপ্ করে নিয়ে যাবে, আর ঝপ্ ঝপ্ করে রেখে যাবে। যাই, এটা দিয়ে আসি। আর, কতদূর তোমার? একী! এখনো সব ছড়ানো যে!

আমি যেতে পারব না।

সুরেন হাসিয়া বলিল—তা আমি জানতুম।—অনর্থক কেন কতক-গুলো টাকা খরচ করালে? টিকিট ফিকিট্ কিনে। বলিয়া সে চটাপট্ শব্দ করিয়া নামিয়া গেল।

স্বামী সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া নহে, নিজের আচরণে নিজেরই কেমন একটা লজ্জা হইতেছিল। এই যাওয়া-না-যাওয়ার তর্ক সেই দিনই নানারূপে কয়েকবার হইয়া গেছে, জোর করিয়া সে যাইতে চাহিয়াছিল এখন 'যাব না' বলিয়া ফেলিয়া যেন তাহার মাথা কাটা যাইতে লাগিল। বেশীর ভাগ, সুরেনের হাসিটায় তাহার আরো কি রকম বোধ হইতে লাগিল। যে 'যাব না' শুনিয়া তাহার স্বামী তাহাকে উপহাস করিয়া গেল, একমিনিট আগে সে কথাটা তাহার অন্তর্যামীও জ্ঞাত ছিলেন না।

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিল, অসহায় নিঃসম্বল পত্নীবিয়োগবিধুর অজয়ের কথা ভাবিয়াই তাহার অন্তরাত্মা হঠাৎ এই বিদ্রোহ করিয়া ফেলিয়াছে।

নন্দরাণী বারেন্দা দিয়া বড়রাণীর আড়াই বৎসরের খুকী মৃন্ময়ীকে

কোলে লইয়া হন্ হন্ করিয়া যাইতেছিল, আলোকের আহ্বানে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল আমাকে ডাকৃছ, ছোটমা ?

ছোটবাবুকে দেখেছিস্, নন্দ ?

ঐ যে আস্তাবলের ওখানে দাঁড়িয়ে একটা লোকের সঙ্গে কথা কইছেন ! ঐ যে কি একটা লাল কাগজ তাকে দিলেন। তুমি দেখনা, ছোটমা !

না দেখিয়াই আলোক বলিল—কাগজ নয়রে ওটা চেক্, পাঁচশ' টাকা ওর দাম, আর লোকটা নরেশ ঘোষ।

নন্দরাণী চঞ্চল হইয়া বলিল—সেই মুখপোড়া মিন্সে বুঝি ? আমার লাফ ফালিস্ করবে বলে বাযট্টি টাকা মড়া আমার ভুগ্‌গে নিয়েছিল ! এবার বাবুকে পেয়ে বসেছে বুঝি ? ও ছোটমা, বাবুকে ডেকে বল মা, পাঁচ পাঁচশ টাকা একেবারে জলে যাবে।

না রে এ সে-সব নয়।...নন্দ এক কাজ কর ত, দেখ্‌ ত মধু এখনো চাকর মহলে আছে কি-না !

নন্দ চলিয়া গেল, তখনি ফিরিয়া আসিয়া বলিল—না, সে ত নেই—ছোটমা !

আলোক ধীরে ধীরে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

সুরেন নিজের ঘরে টেবিলে বসিয়া ক'খানা চিঠি লিখিতেছিল ;—চারিদিকে খাম চিঠির কাগজ ছড়ানো, দু'তিনটা ফাউণ্টেন পেন্ খোলা পড়িয়া রহিয়াছে—আলোক ঘরে ঢুকিতেই বড় আর্শীখানায় তাহার ছায়া দেখিতে পাইয়া সুরেন একটা কলম তুলিয়া লইল। আলোক তাহার কাছেই আসিতেছিল, কিন্তু যে মুহূর্তে দেখিল, স্বামী তাহার আগমন

উপেক্ষা করিতেই কলম তুলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন--সেইক্ষণেই সে মুখ ফিরাইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

পাঁচ মিনিট পরে সুরেন মুখ তুলিয়া আর্শীতে দেখিল, আলোক ম্লান-মুখে দাঁড়াইয়া কি একটা নাড়াচাড়া করিতেছে। একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসিল—কিগো, মত বদলেছে না-কি ?

আলোক সে কথার জবাব দিল না, শুনিতে সে ঠিকই পাইয়াছিল, ইচ্ছা করিয়াই জবাব দিল না।

সুরেন পুনরায় জিজ্ঞাসিল—বলি, মতটত বদলাল ?

কিসের মত—বলিয়াই আলোক আগুনের মত দৃষ্টিটা ফিরাইয়া লইল।

তবে বদলায় নি দেখ্‌ছি। বদলাবে না যে, তা'ও আমি জানি।—বলিয়া মৃদু হাসিয়া, একটি কটাক্ষ করিয়া পত্ররচনায় মন দিল।

ইহা বোধ করি সর্ব্ববাদীসম্মত যে সুপ্ত সিংহ আর সুষুপ্ত নারীকে খোঁচাইয়া তুলিতে নাই। উভয় কার্য্যই সমান বিপজ্জনক। সুরেন-ও যে তাহা না জানিত এমন নহে, কিন্তু কেমন একটা ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছিল, যাহার ধাক্কা সামলাইবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিতে বিন্দুমাত্র বিলম্বও হইল না।

আলোক সরিয়া আসিয়া বলিল—এমন সর্ব্বজ্ঞ তুমি কবে থেকে হলে! সবই যখন জান, বলতে পারো কি, যে সব লোক ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ায়; দেশের কাজ, দশের কাজ বলে চেঁচিয়ে আকাশ পাতাল বিদীর্ণ করতে থাকে; দুর্ভাগা দেশের দুর্ভাবনায় যাদের নিদ্রা নাই; গরীব দেশের অন্নকণাও যাদের পেটে যায় না—তার বদলে

পোলিটির খানা, অনিদ্রায় হুইস্কির কেশ্, চেঁচিয়ে রায় বাহাদুর, সি আই ঈ, বনের মোষেই সন্তুষ্ট, নিজের ঘরের, আত্মীয় দরিদ্রের সংবাদ রাখবার অবসর নেই—তাদের উপযুক্ত শাস্তি কি—বল্‌তে পারো ?

এর মানে কি আলোক ?

এর মানে ! এর মানে এই যে দেশের নাম করে' দশের কাজ বলে এ দেশের যত সর্ব্বনাশ তোমরা করেছ এত আর কেউ করে নি। বিদেশী বিজাতীও নয়। যার যতটুকু স্বার্থ সেইটুকুর জন্যেই সে গলাবাজী করছে ; দেশের কোন হতভাগার জন্যেই সে মাথা ঘামায় না। মাথা ঘামানো দুরের কথা, কটা গরীব, কটা গৃহহারা তোমাদের মনে স্থান পায় যত মোটরওলা, খেতাবধারী লোকের কথা ভাব তোমরা ! সত্যি করে' বল, এই কি না !

সুরেন রুদ্ধরোষে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—শেষে তোমার সঙ্গে এ তর্কই করতে হবে ? তুমি এর বোঝ কি ?

বুঝিনে বলেই ত বুঝতে চাচ্ছি। তুমি ত সর্ব্বজ্ঞ, বুঝিয়ে দাও না।

সুরেন অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু চেঁচামেচি না করার মত শিক্ষা ও সংযম তাহার ছিল। সে আত্মদমন করিয়া কেবল কহিল—আলোক, স্বামীকে ভালবাসতে না পার, ভক্তি করতেও না পার যদি তা'কে উপেক্ষা অবহেলা কর' না। সে হয় ত সবই সহ্য করতে পারবে, কিন্তু তোমাদের নারীধর্ম্ম তা সইবে না, কোনমতেই না।

নারীধর্ম্ম তাহা সহিবে না ! আলোকের মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নারীধর্ম্মের দোহাই পাড়ে সে, যে পতিধর্ম্মের কোন মর্য্যাদাই রাখিয়া চলে না। হা রে পুরুষ। এই নারীধর্ম্ম কি, তাহাই

তোরা জানিস্ না! নারীর হৃদয় কি ইলেক্‌ট্রিকের বাতি যে সুইচ খোলা থাকিলে দিবারাত্রই তাহার আলো সমানভাবে জ্বলিয়া যাইবে! এক আধ জনের নহে, এমন ভ্রান্ত ধারণা অনেক মূঢ় পুরুষেরই আছে, যাহারা মনে করে, সব সময়েই গৃহে তাহার নারীটি অফুরন্ত তৈলসলিতায় হৃদয় দীপটি জ্বালাইয়া রাখিয়াছে! ইহাই মনে করা তাহাদের পুরুষত্ব না পাইলেই অপরাধ নারীধর্ম্মের! অথচ নারীধর্ম্মের এই উজ্জ্বল বর্ত্তিকাটি জ্বালাইয়া রাখিতে যে সব চেয়ে দরকার করে তাহার পতিধর্ম্ম—এ ত পুরুষ বুঝে না, বুঝিতে চাহে না। যেন পাওনার দাবী করিতেই তাহারা পুরুষ হইয়া নারীর অপেক্ষা বলবান, হৃদয়বান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পাওনার খাতার পাতাতেই বড় বড় অঙ্ক পাতিয়া যায়, দেনার খাতখানি পোকায় কাটিয়া অস্থিসার করিয়াছে এ তাহাদের নজরে পড়ে না।

সুরেনের মুখে নারীধর্ম্মের কথায় আলোকের এই সবই মনে পড়িয়া গেল। আর সেই সঙ্গেই যত ক্ষোভ, দুঃখ নিরাশা মনের পাতায় চাপা ছিল, হঠাৎ সব দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আহত শার্দ্দুলের মত বলিল—দেখ, আমার ধর্ম্ম অধর্ম্মের সহ্য কতদূর, সে আমার জানা আছে। বোধ হয় তোমাদেরই জানা নেই যে কা'র কতখানি দাবী, কারই বা কতখানি পাওনা! তা জানা থাকলে এমন দুর্ব্যবহার করতে কখনই সাহসী হ'তে না।

সুরেন অনেকক্ষণ কথা কহিল না। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসিল —আমি দুর্ব্যহার করেছি? তুমি এই কথা বল্লে আলো?

সুরেনের অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে আলোক যেন হঠাৎ চৈতন্য ফিরিয়া

পাইয়া একেবারে নিস্তেজ হইয়া গেল। একটি কথা কহিবার শক্তিও তাহার রহিল না।

সুরেন আবার বলিল—এ কথা এতদিন বলনি কেন আলো? গোপনে এ আগুন মনে জ্বালিয়ে নিজেও কষ্ট পেয়ে এসেছ এবং আমাকেও আজ পুড়িয়ে দিলে!—সে থামিল। বাস্তবিক যেন বহুদিনের বহু পুরাতন ঘটনাগুলি খুঁজিয়া হাতড়াইয়া বেড়াইতে লোকে যেমন আকুলি বিকুলি করে সুরেনও সেইরূপ হাতড়াইয়া যা খুঁজিতেছিল না পাইয়া, আরও শুষ্ক নীরসকণ্ঠে কহিল—কিন্তু আমি ত কিছুতেই বুঝ্‌তে পারলুম না কোথায় তোমার সঙ্গে আমি দুর্ব্ব্যবহার করেছি। আমি মাতাল, অমানুষ, পশু নিজের ব্যবহার সু কি কু বুঝতে পারি নি বলেই মনে করতে পারছি নে হয়ত কিন্তু তুমি ত বুঝেছিলে, তুমি কেন তখনই আমাকে বলনি, আলো? তুমি কেন পশুর মুখ চেয়ে সে সব গোপন করে এত বেদনা ভোগ করলে!

কান মাথা দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া যেন আগুণের ঝলকের মত কথাগুলা কোথায় প্রবেশ করিয়া যাইতেছিল, আলোক তাহারই ঝাঁজে ঝলসিয়া মরিতেছিল, কিন্তু নড়িবার চড়িবার শক্তি তাহার একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছিল, কোন সাড়াই দিল না।

সুরেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তবুও আজ তুমি ভালোই করেছ। নইলে সে হয় ত ক্রমশঃ বেড়েই যেত; কোথায় গিয়ে যে শেষ হত তার ঠিকই ছিল না। বেশ করেছ আলো, বেশ করেছ! বেশ, বেশ!—যেন সে মনের অত্যন্ত উল্লাসে হাততালি দিয়া ঘরময় শিশুর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কিসের তরে এত উল্লাস তাহাই জানিতে

যখন আলোক অকস্মাৎ মুখ তুলিল, দেখিতে পাইল, সুরেনের দুটি চোখের কোণ ছাপাইয়া কোথাকার বন্যা হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। যাহাকে উল্লাস মনে করিয়া আবার তাহার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছিল যখন জানিতে পারিল প্রকৃতই সে কি—তখন নারী একেবারে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল—তুমি আমার গলায় পা দিয়ে দাও যেন আর কথা কইতে না প্যারি !

সুরেন বলিল—কেন, সত্য কথা বলেছ বলে ? না আলোক, সত্যের আদর আমার মত পশুর কাছেও পাবে।

আলোক হেঁছড়াইয়া দেহটাকে সুরেনের পায়ের কাছে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—মাপ করবে না আমাকে ? বল, করবে না ?

সুরেন ধীরস্বরে জিজ্ঞাসিল—কিসের জন্যে ! অন্যায় তুমি কি করেছ ?

করবে না, তাই বল ! না তা হবে না, বলিয়া সে জোর করিয়া সুরেনের পা চাপিয়া ধরিল, বলিল—তুমি থাক্‌তে পার, কিন্তু আমি ত বাঁচব না। তোমার কাছেও যদি একটা অপরাধ করেছি বলে মার্জ্জনা না পাই, আমি কোন মতেই বাঁচব না, কোনমতেই না। – বলিতে বলিতে সে সুরেনের পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

সুরেন তাহাকে তুলিতে তুলিতে বলিল—এমন করে বলে ? ছিঃ।

আলোক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—তুমিই বা কেন সে কথা বল্লে ? নারীর ওর চেয়ে কলঙ্ক, ওর চেয়ে যন্ত্রণা যে আর নেই তা কি তুমি জান্‌তে না ? মেয়েমানুষ সব সহ্য করতে ও খোঁটা সহ্য করতে পারে না।

যেন আপোষে মিটমাট হইয়া গেছে এমন ভাবে সুরেন বলিল– যাও মুখ টুখ গুলো ধুয়ে ফেল গে। কেঁদে একেবারে নদী নালা বহিয়ে দিয়েছ !

মৃদু হাসিতে, মিলনের অভিমানে হাসিয়া কাঁদিয়া আলোক ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

—১৫—

সাড়ে সাতটার সময় সুরেন সুসজ্জিত বেশে ঘরে ঢুকিয়া সস্নেহে বলিল আমি আসি আলো! হঠাৎ আলোকের পোষাক পরিচ্ছদের দিকে নজর পড়ায় একটুখানি বিস্মিত হইয়া গেল। আলোক তখনই বলিয়া উঠিল—চল। বলিয়া সে-ই অগ্রবর্ত্তিনী হইল।

সুরেন কহিল—একটু দাঁড়াও, আরও দু'চারটি কথা তোমাকে বলে যাই। ফিরতে আমার কত দিন হবে তার কিছুই ঠিক নেই! তবে খবর আমি রোজই দেব।

আলোক মৃদু হাসিয়া বলিল—আর কিছু বলবে?

সুরেন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ঈষৎ রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসিল—তোমার কি বড্ড তাড়া আছে?

আলোক উচ্ছ্বল হাস্যের সহিত বলিল—তাড়া আমার নেই, তোমার আছে। গাড়ী কি তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে—বলতে পার?

কোন্ গাড়ী?—কিছুতেই যেন তাহার বিস্ময় অপনোদন হইতেছিল না, উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

আলোক বলিল—কোন্ গাড়ী আবার! পাঞ্জাব মেল গো, পাঞ্জাব

মেল! হাঁ করে রইলে যে! কি মুস্কিল! চল-না, যা বলবার আছে, রাস্তাতেই বলবে।

সুরেন জিজ্ঞাসিল—তুমি হাওড়া যাবে?

যাব বৈ-কি! হাওড়া কেন, দিল্লী অবধি যাব মনে করছি।

কথাটা এতই অবিশ্বাস্য যে সুরেন এক মিনিট পর্য্যন্ত সাড়া দিল না। তাহার পরে ধীরে ধীরে বলিল—কি ছেলেমানুষী সুরু করে দিলে তুমি!

দীপ্তকণ্ঠে 'ছেলেমানুষী' কথাটা পুনরুচ্চারণ করিয়াই আলোক মুখ নামাইয়া লইল।

সুরেন ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—নয় কি?

যে কণ্ঠের স্বরের যত রকমের অভিব্যক্তির সহিত আলোকের কান দুইটি অত্যন্ত সুপরিচিত, তাহার ব্যঙ্গের স্বর যে তাহার কর্ণের ভিতর দিয়া বক্ষে গিয়া আঘাত না করিল তাহা নহে, কিন্তু প্রবল চেষ্টা স্বত্বেও সেই মুখ কোনমতেই সে আর সোজা করিয়া তুলিতে পারিল না।

সুরেন হাতটি বিস্তৃত করিয়া কব্জীতে বাঁধা ঘড়িটা দেখিয়া বলিল—এই রকম করে তুমি হয় ত খুব আনন্দ পাও—হয় ত কেন, পাও-ই, কিন্তু সকলেই যে পাবে তার কোন মানে নেই। বলিয়া সে দৃক্‌পাত না করিয়াই বাহির হইয়া যাইতেছিল, আলোক স্খলিতচরণে তাহার হাতটি ধরিতে উদ্যত হইয়াছে, দরজার বাহিরে ঠিক সাম্‌নে দাঁড়াইয়া বড়রাণী সুরেনেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

আজই দুপুর বেলা এমন একটা কুশ্রী কাণ্ড হইয়া গেছে যাহা মনে করিতেও আলোকের হৃৎকম্প হইতেছিল। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, স্বামীর মনে আঘাত লাগিয়াছে এই ব্যথার ভারেই তাহার হৃদয়ের অন্ত

সমস্ত ইচ্ছা অনিচ্ছা ঝাড়িয়া মুছিয়া সে তাঁহার কথা রাখিতে দিল্লী যাইতে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে কখনই ভাবে নাই সুরেন এমনভাবে তাহাকে সঙ্গে লইতে প্রত্যাখ্যান করিবে! সে ধারণা ত ছিলই না, ইহাও সে জানিত না, জীবনে আর কোনদিন কোন কারণেই এমন কথা বলিবে যাহাতে সুরেন আঘাত পায়! আজ দুপুরের কাণ্ডটা যে এতই সহজে মিটিয়া গেছে, সুরেন তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছে ইহাতেই সে যৎপরোনাস্তি আরাম অনুভব করিয়াছিল, আর কখনই যে সেই কুৎসিৎ নাটকের পুনরাভিনয় হইবে এবং তাহার দ্বারাই হইবে এ সে স্বপ্নেও ভাবে নাই! কিন্তু না ভাবিলেও কার্য্যতঃ ঠিক তাহাই হইল।

অজয় পীড়িত, দরিদ্র, অসহায়, নিঃসম্বল তাহার সাহায্য করিতে সে ধর্ম্মতঃ বাধ্য এই জ্ঞানেই তাহাকে তুলিয়া লইয়াছিল; সে কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া, তাহাকে ফেলিয়া সে যে সুদূর প্রবাসে যাইতে চাহিয়াছিল সে কেন? কিসের উদ্দেশ্যে? সুরেন যখন এ কথা বুঝিল না, উপরন্তু ব্যঙ্গ করিয়া উড়াইয়া দিল, নারী আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না।

কি দু' একটি কথা কহিয়া বড়রাণী সুরেনকে দাঁড়াইতে বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেই আলোক নিকটে আসিয়া ছলছলনেত্রে কহিল —আমাকে নিয়ে যাবে না?

সুরেন বলিল—না।

আলোক কঠিনস্বরে বলিল—বেশ, আমি যাব না। কিন্তু একটা কথা বলে যাও, স্ত্রী কি চিরদিন স্বামীর দয়ারই ভিখারিণী? অনুগ্রহ ভিন্ন তাদের প্রাপ্য আর কিছুই নেই?

সুরেন এ দিক ওদিক চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল—এ কথা কেন?

কেন সে তুমিই জান ! না—বল্‌তে হবে তোমাকে ! বল—

আমি জানিনে ওসব।

নিজের মনের কথা বলবে, জানিনে বলে প্রবঞ্চনা কর কেন?

প্রবঞ্চনাও জানিনে, তোমার প্রশ্নের উত্তরও জানিনে। বলিয়া সুরেন বড়রাণীর আগমন পথের দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল। সে যে ইচ্ছা আর চেষ্টা করিয়াই পত্নীর কাতর করুণ মুখের পানে চাহিতে বিরত হইতেছিল, তাহা বুঝিয়াই রমণীর মন বিরোধতিক্ত হইয়া উঠিল। আলোক তীব্র স্বরে কহিল—তাও না জান—স্ত্রীকে যে ভালবাসতে হয় এও কি তোমার বিধাতা তোমাকে শেখান নি?

আহত পশুর মত সুরেন ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল। কি একটা কথা বলিতে গিয়া বলিল না। একমুহূর্ত্ত পরে স্থিরকণ্ঠে কহিল—তোমাকে আমি ভালোবাসি কি না, আমার বিশ্বাস ছিল, আমায় চেয়ে সে'টা তুমিই ভালো জান, আলোক। পৃথিবীতে দু'টি জিনিষ আমার ভালো বাসার, প্রথম তুমি, দ্বিতীয়—থাক্—সে কথা! আলোক, তোমাকে আমি ভালোবাসি কি-না সে উত্তর কোনদিনই আমি দিতে পরেব না এবং তার তর্ক কোনদিনই কোন আদালতেই উঠবে না বলেই আমার বিশ্বাস।—অদূরে বড়রাণীকে দেখিয়া সুরেন অগ্রসর হইতেই, আলোক ভূতলে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল।

সুরেন দু একপা' অগ্রসর হইয়াছিল, তখনি ফিরিয়া আসিয়া বলিল—মধুকে তুমি অকারণ তিরস্কার করেছ। বেচারার এমন কি দোষ হয়েছে বল ত? অজয় বাবুকে আটকে রাখবার ক্ষমতা সে পাবে কোথা থেকে? তুমি হ'লে পারতে!

আলোক আড়ষ্টের মত দাঁড়াইয়া কথাগুলি শুনিল। সুরেন আবার বলিল—তুমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, আমি তাকে বাহাল রাখলুম! অকারণে একজনের অন্ন মারতে আমার কষ্ট হয়!

খোঁচা পাইয়া সাপ যেমন ফণা তুলিয়া গর্জ্জিয়া উঠে, আলোকও তেমনি গর্জ্জাইয়া বলিল—আমি তা'কে তাড়িয়েছি, সে বুঝি এই নালিশ করেছে?

সুরেন অবিচলিতকণ্ঠে কহিল—সে নালিশ করে নি। আমি নিজের কানেই শুনেছি।

শুনেছ?

সে তর্ক করবার আমার সময় নেই, করে' লাভও নেই। তবে তুমি ইচ্ছে করে' যে কিছুই করনি তা আমি জানি। তখন তুমি প্রকৃতিস্থ ছিলে না।

আলোক শিশুর পাঠ মুখস্থ বলার মত আবৃত্তি করিল—প্রকৃতিস্থ ছিলুম না!

না থাক্‌বারই কথা। এত কষ্ট যার জন্য করছ তুমি, যার পায়ের কাঁটাটি তুলে দিতে ··· ···ওঃ বড্ড দেরী হয়ে গেল যে—বলিয়া সুরেন দুপ্‌ দুপ্‌ করিয়া নামিয়া গেল।

তাহার পায়ের শব্দ মিলাইয়া গেল, ক্রমে মোটর গাড়ীর শব্দও আর শোনা গেল না; কিন্তু যে আগুণ সুরেন জ্বালাইয়া দিয়া চলিয়া গেল, সে আর নিভিতে চাহিল না। বায়ু ভরে নাচিয়া নাচিয়া অগ্নিশিখা সেই স্বর্ণ প্রতিমাকে বেড়িয়া বেড়িয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল। আর অভাগিনী নারী তাহারই মধ্যে দাঁড়াইয়া অব্যক্ত যন্ত্রনায়

পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। বড়রাণী নিকটে আসিয়া বলিলেন—কিরে যাবি নে ?

না।—বেশী কথা বলিবার শক্তি তাহার ছিল না।

প্রশ্নের পর প্রশ্নে বড়রাণী তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিলেন, কিন্তু যে মূহূর্ত্তে দেখিলেন, আলোকের চক্ষু বহিয়া দরদর ধারে অবিরাম বর্ষার স্রোত নামিতেছে, তাহার হাত ধরিয়া ঘরে টানিয়া বিছানায় বসাইয়া আদর করিয়া বলিলেন—একি তো'কে সাজে আলোক! ছি! কাঁদে না, ওঠ্। কোন্ পুরুষ আর বিদেশে না যায়—তাই বলে তাদের স্ত্রীরা কি তোর মত কাঁদতে বসে? নে ওঠ—মুখটায় জল দিয়ে আয়।

তবুও আলোক উঠিল না। বড়রাণীর সব কথা তাহার কানে গেল কি না কে জানে তখন তাহার দু'টি কানের মধ্যে কোথাকার তপ্ত বালির ঘনীভূত উত্তাপ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। অনেকদিনের অনেক কাতরতার, অনেক আরাধনার একটা জটিল সমস্যার যেন আধখানা মীমাংসা হইয়া হঠাৎ থামিয়া গেছে! আজ সে জানিতে পারিয়াছে রমণী জনমের শ্রেষ্ঠ সম্পৎ তাহার খনির তিমির গর্ভে হীরক খণ্ডের মত দীপ্ত হইয়া আছে! এ রত্ন যাহার আছে, কিসের অভাব তাহার! কহিনূরের অধিকারী যেমন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই মহামূল্য সম্পদের সমাদর বুঝিয়া থাকে আলোকের হৃদয় মন জুড়িয়া সেই একটি ছত্রের কথা কয়টি যেন কোলাহল করিয়া বেড়াইতেছিল! তবুও সে তাহার শেষ জানে না! গভীর অতল জলই যে সুস্থির উদাসীন হইয়া থাকে, সামান্য ঝঞ্ঝা বণ্যায় সে যে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করে না এ অভিজ্ঞতা ছিল

না বলিয়াই স্বামীর মুখের অতবড় অভয় বাণীর পরেও সন্দেহ দোলায় দুলিতে দুলিতে কোনমতেই সে অশ্রু রোধ করিতে পারিল না।

এবং তাহার কারণ যথেষ্টই ঘটিয়াছিল। শেষকালে সে কি শুনিল? কি নিদারুণ মর্ম্মভেদী কথাই না তাহার কানের ভিতর দিয়া তপ্ত লৌহ শলাকার মত প্রবেশ করাইয়া দিয়া গেছে সে, যাহার কথাতেই সে অনেক দিনের অনেক অশান্তির পর হৃদয়ের সুনিবীড় সুনির্জ্জনে সুখচ্ছায় বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্রনীড় রচনা করিতেই তৎপর হইয়াছিল! সুরেন অন্তরের কথা তাহাকে জানিতে দেয় নাই। সে সুযোগ না দিয়াই সে চলিয়া গেল! হয়ত এত তাড়াতাড়ি চলিয়া না গেলে ইহার একটা শেষ শুনিতে পাইত, চাই-কি মীমাংসা করিয়া লওয়াও চলিত। কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। এ যেন কোন্ ভীষণ কঠিন আদালতে বিচারের পূর্ব্বেই মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিয়া বিচারক চলিয়া গেল।

এই জাতীয় পুরুষই সব চেয়ে নির্ম্মম, সব চেয়ে মারাত্মক, সাহস করিয়া কোন কথাই যাহারা বলিতে পারে না, অথচ যাহাদের মন সকলের চেয়ে বিষাক্ত, কটু সন্দেহ পূর্ণ! সুরেনের হৃদয়ের এ-দিকটার সহিত আলোকর পরিচয় ছিল না। যে মুহূর্ত্তে সেই পরিচয়ের সুযোগ ঘটিল, আলোকের বিরোধতিক্ত অবসন্ন মন একেবারে সেই কাপুরুষের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গিয়া চৈতন্য হারাইয়া অবশ, অসাড় হইয়া আছাড় খাইয়া পড়িল।

আজ যেন একমুহূর্ত্তে জন্ম মৃত্যু ইহকাল পরকাল—যা কিছু সব, ছায়াবাজির মত ছবি দেখাইয়া খেলা শেষ করিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। আজই সে সব পাইয়াছিল, আজই বুঝি সে সব হারাইল! সব চাওয়া

সব পাওয়া—সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কি বীভৎস পরিণাম! এর চেয়ে সে যদি সারাজীবন ভিখারীর মত শূন্য পাত্র হাতে লইয়া ভিক্ষার আশায় দাঁড়াইয়া জীবনের শেষ দিনে উপনীত হইতে পারিত, তাহাতেই বা কি এমন ক্ষোভ থাকিত!

কিছু না :—আলোকের মন বলিল –না, তাহা হইলেই তাহার শূন্য জীবন ধন্য হইত; তাহার রিক্ত পাত্র অমূল্যরত্নে ভরিয়া উঠিত! কিন্তু হায়! সে-সবের কিছুই হইল না। জীয়ন্তে সুখ বসন্তের প্রথম সমীর স্পর্শেই সে বাঁচিয়া মরিয়া গেল।

বড়রাণী বুঝাইতে লাগিলেন—আর ত তুই ছেলেমানুষটি নস্, এখন সবই বুঝতে পারিস, পুরুষ মানুষ কি ঘরের কোণে বদ্ধ থাক্‌তে পারে? না তাই থাকা তার উচিৎ? তার উপর এই দেখ্—ঠাকুরপো এই যে দেশের কাজের জন্যে এত করে বেড়াচ্চে তোর কাছে উৎসাহ না পেলে—ওর আগ্রহ কি স্থায়ী হবে? কখনই হ'বে না। দেশের কল্যাণে যা করতে যাচ্ছে—

আলোক মুখ তুলিয়া বলিল—দেশের কল্যাণে কে বল্লে দিদি? নিজের কল্যাণে, নিজের কল্যাণে, আর কিছুই নয়।

বড়রাণী তাহাকে সহজ ভাবে কথা কহিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট মনে বলিলেন—বেশ ত, তাই যদি হয়, নিজের কল্যাণ কি দেশের কল্যাণ নয়? সবাই জনে জনে যদি নিজের কল্যাণের চেষ্টা করে, সে কি দেশেরই মঙ্গল নয়?

একটু থামিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন—আমার বাবা বল্‌তেন, যে উদ্দেশ্যেই হোক্ দেশের কাজ করা হ'লই ধর্ম্ম! যে নিজের মঙ্গল জানে না

সে দেশের কল্যাণ করবে কি করে? আপনাকে যে চেনে না, নিজের দেশকে সে চিন্‌তে পারবে কেমন করে? আর সেই দেশের উপর তার শ্রদ্ধা ভক্তি কর্ত্তব্যই বা আস্‌বে কোত্থেকে?

তিনিও লাট-সভার মেম্বর ছিলেন, না-দিদি?

একাদিক্রমে ন'বছর। আমি বাবার মুখেই শুনেছি প্রথম যে বছর তিনি দাঁড়ান তাঁকে কত কষ্ট পেতে হ'য়েছিল, কত পয়সা খরচ করতে হ'য়েছিল তার পরে লোকে তাঁকে সাধ্‌ত! লোকে যখন দেখলে বাবা দেশের জন্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করছেন, তারা যেমনটি চায়, লাটসভায় লড়াই করে তিনি তাই পাইয়ে দিচ্ছেন তখন তারা আর তাঁ'কে ছাড়তে চাইত না।

তিনি ছাড়লেন কেন তবে?

বড়রাণী তদ্‌গতচিত্তে বলিলেন—বাবা বল্লেন, আমি বুড়ো হ'য়েছি, ছেলেছোকরা যা'দের এখন খাটবার সময় তারা খাটুক! তিনি কিছু চিরদিন থাকবেন না—ছেলে ছোকরারা এখন থেকে উপযুক্ত না হ'লে পরে যে ঠক্‌তে হ'বে—তাই তিনি নিখিল বাবুকে সে বছর মেম্বর করিয়ে অবসর নিলেন। যারা সব নিখিল বাবুর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল তারা যখন দেখ্‌লে বাবা তাঁর জন্যে খাটছেন, তখন তারা সরে গেল। দেশের লোক এত সম্মান করে, অনেকে আবার ভয়ও করে।

আলোক অন্যমনস্কভাবে বলিল—কিন্তু ভাই বাবাকে দেখে ও-সব কিছুই মনে হয় না। কি-রকম শান্ত, স্থির স্বভাব, মুখে হাসিটি লেগেই আছে।

আলোক বিবাহ হওয়াবধি সুবোধ বাবুকেই (বড়রাণীর পিতা) পিতৃসম্বোধন করিয়া থাকে।

বড়রাণী পুলকিতচিত্তে কহিলেন–আমি জন্মাবধি ঐ রকমই দেখছি। হয়ত বাবাকে অন্যরকম দেখলে আমরা মা'র শোক ভুলতে পারতুম না।—যে শোক ভুলিয়াছেন বলিয়া গর্ব্ব করিলেন সেই কথা কয়টি বলিতে বলিতেই বড়রাণীর গলা ধরিয়া আসিল।

বিন্দু ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ছোট মা, বউবাজার থেকে একটি ছেলে একখানা লেখন এনেছে, বলছে তোমার ভগ্নীপতির কথা লেখা আছে।

আলোক হাত বাড়াইয়া বলিল—কৈ-দে।

বিন্দু বলিল—ছেলেটি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে লেখন নিয়ে—ডাকব?

বড়রাণী বলিলেন—কি বোকা তুই বিন্দু? তা'কে না-ই বা আনলি, চিঠিখানা ছোটরাণীর নাম করে চেয়ে আন্‌-না। মাথার চুল ত একগাছি কাঁচা নেই, বুদ্ধিটায় ত একটু রঙ-ও ধরল না। যা, লেখন চেয়ে নিয়ে আয়।

বিন্দু চলিয়া যাইতেছিল, বড়রাণী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আর দেখ বিন্দু, ছেলেটিকে বসিয়ে টসিয়ে রেখে আসিস্‌—বরং লাইব্রেরীতে বসিযে রাখ—বুঝলি?

মাথা নাড়িয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া বিন্দু কক্ষ ত্যাগ করিল। আলোক-যে পত্রের আকুল আগ্রহে পথ চাহিয়া রহিয়াছে বড়রাণী ইহা বুঝিয়াই কোন কথা বলিলেন না। বাস্তবিক আলোকের এই ক'দিনের আন্তরিকতাটুকুতে তাঁহার অসীম আনন্দ হইয়াছে। পরের দুঃখে সহবেদনা জানাইতে অনেক মেয়েই পারে না, যাহারা পারে তাহারা

দৌর্ব্বল্যজ্ঞানে করিতে চায় না ; আবার এমন অনেক মেয়েকে বড়রাণী দেখিয়াছেন দরিদ্রের ব্যথা যাঁহাদের নিকট অত্যন্ত উপেক্ষার, অশোভনীয় বিবেচিত হইয়া থাকে। যেন এক দারিদ্র অপরাধ তাহাদিগকে মনুষ্য সমাজের আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দিয়াছে।

বড়রাণীর বাবার সেই কথাগুলি মনে আছে—আফিসের বড়বাবু আর কেরাণীর গল্পটা। কেরাণী অসুখ হইয়া আফিসে না আসিলে ধমক, ভয় প্রদর্শন। পুনঃ পুনঃ অসুখে বেতন কর্ত্তন, পালা জ্বরে উইদাউট্ পে, কর্ম্মচ্যুতি, অবশেষে সার্টিফিকেট বাজেয়াপ্ত। আর বড়বাবুর তিন বার কাশি—তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে গৃহ প্রত্যাগমন, মাথা ধর'লে গৃহে বিশ্রাম, (ঔষধ ত আছেই) একাদশীতে বাতিক বৃদ্ধি—কেরাণীকুল দলবদ্ধ হইয়া দেখিতে যাইবেন (!) তিনদিনের জ্বরে থ্রি মান্থস পে এড্ভান্স ও স্পেশাল লিভ্। ফিরে এসে বল্লেন—কাজ কর্ম্ম পিছিয়ে যাচ্ছে' আর থাকৃতে পারলাম না। তোমার ক্ষতি—আমারই ক্ষতি। সাহেব টাকে হাত বুলাইয়া মেমো ক্যালেণ্ডার এ লিখিল—স্পেলেনডিড্। —সত্যমিথ্যা জানেন না বড় রাণীর উভয়কুলে (পিতৃমাতৃ) কেরাণী কেহ ছিলেন না, কিন্তু তিনি ভাবিতেন, ইহা যদি সত্য হয়, সে কায়মনে সেই সব বড় বাবুদের জন্য ম্যালেরিয়া, পালা কালা এবং যতরকমের জ্বর আছে সব প্রার্থনা করিত। আর চাহিত হে ভগবান! এই কর্ম্মচ্যুতি-ভীতি পলে পলে যাহাদের রক্ত শুষিয়া লইতেছে তাহাদিগকে নীরোগ কর, স্বাস্থ্য দাও সম্পৎ দাও। তোমার অভয় তাহাদের নির্ভয় করুক। আর যদি পার হে দীনবন্ধু, কলমের মায়াটা ছাড়িয়ে, একবার তাদের টেনে পথে ফেলে দাও, কলমের বদলে নিড়েন নিক্, কিছু না পারে তারা, এই

দেশটার মাটিশুদ্ধ নিড়াইয়া, উপড়াইয়া এমন এক মহাসমুদ্রে ফেলে দিক্, যেখান থেকে আবার নবীন জন্ম, নবীন জীবন সুরু করে দিতে পারে।

এ-সব বড় বড় কথা, এখানে আসিয়া দু'একবার এ-রকম মত প্রকাশ করিয়া আলোকের ভাসুরের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছিলেন! তদবধি তিনি একান্তমনে এবাড়ীর মতেই মত দিয়া আসিয়াছেন। তবে এবার একটু আশা হইয়াছে। সুরেন একসময়ে বোম্বাইয়ের সেই লোকমান্য মহাপুরুষের অত্যন্ত ভক্ত ছিল, আজও আছে, সেদিনও তিনি এবাড়ীতে আসিয়াছিলেন; সুরেন যে বাস্তবিক তাহার পিতার অনুরূপ স্বাধীনচিত্তে স্বদেশের কাজ করিতে পারিবে সে বিষয়ে বড়রাণীর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আজ মনের কথা মনেরই অজ্ঞাতে আলোকের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে, আর সব জিনিষেরই এমনি মজা—প্রকাশের প্রথম সঙ্কোচ-সরম উত্তীর্ণ হইতে পারিলে আর বাঁধে না, বড়রাণী গদগদস্বরে কহিলেন—হ্যাঁরে ছুটি, কাউন্সিলে যেতে ঠাকুরপো গুরুদেবের মত পেয়েছে?

আলোক অন্যমনস্ক ভাবে কহিল—তা ত কৈ কিছু শুনি নি।

বড়রাণী বলিলেন—বিন্দী মাগী .....

বিন্দী ঘরে ঢুকিয়া বলিল—কি করলে আবার বিন্দী মাগী? এই নাও গো লেখন নাও। আর তেনাকে নাইব্রেরী ঘরে বসিয়ে রেখেছি।

আলোক চিঠিটা পড়িয়া ফেলিয়া দিল। পরুষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ন্যাকামী!

বড়রাণী বার দুই চিঠিখানা মনঃসংযোগ করিয়া পড়িয়াও তাহাতে ন্যাকামীসূচক কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না। বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসিলেন—কিরে আলো?

আলোক বিকৃতস্বরে বলিল—অজয়বাবুর ছবি আছে কি না আমি জান্‌ব কেমন করে? আমার কাছে থাকবে, না তাঁদের বাড়ীর পাশেই ত অজয়বাবুর বাড়ী--সেখানেই থাকবে!

বড়রাণী একমিনিট পরে বলিলেন---চিঠিতে নাম নেই কারু, কে লিখেছে জান্‌লি কেমন করে?

বলি নি তোমাকে বুঝি সে কথা! বাড়ীটার পাশেই একটি বামুন-দের মেয়ে বিধবা আছেন তাঁরই লেখা। এ ক'দিন তিনিই ত খাইয়েছেন, দাইয়েছেন।

বড়রাণী জিজ্ঞাসিলেন—তাঁরই লেখা?

আলোক মুক্তাসাজান সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছত্রের পানে চোখ বুলাইয়া বলিল—তাঁরই লেখা, এমন লেখা আর কারুই হ'তে পারে না।

বড়রাণী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন, আলোক অনুচ্চস্বরে পাঠ করিল.—

ভাই,

অজয়বাবু ত সমস্ত দিন, এত রাত অবধি ফিরিলেন না। এবাড়ীর সকলেই খোঁজ খবর করেছে, খবর পাওয়া যায় নি। এখন তারাই বলছে পুলিসে হুলিয়া করতে! কিন্তু হুলিয়া করতে হ'লে ফটো চাই, আমি ত জানি না ফটো আছে কি নেই। আছে কি? সত্যি বড় ভয় হচ্ছে ভাই।

আমি যে তাঁকে দেখি নি, নইলে কি ভাবনা ছিল! একবার একখানি ছবি এঁকেছিলুম কেবল স্মৃতির তুলির কালিতে! যে দেখেছে সেই বলেছে বিলেতের তোলা ফটো!—কিন্তু আমি ত তাঁকে দেখি নি।

কোন ধারণাই যে আমার নেই! আজ মনে হচ্ছে ভায়ের মুখ দেখি নি, এ গর্ব্বও পোড়ার মুখে বেরুচ্ছে, হারে হতভাগিণী নারী কিন্তু তার কারণ এ নয়—তার কারণ এ পোড়ামুখ, রাক্ষসের মুখ কি কাউকে দেখাবার!

ফটোর জন্যে কিছু করা যাচ্ছে না। ইতি।

পড়া শেষ করিয়া মুখ তুলিতেই বড়রাণী বলিলেন—মেয়েটি বেশ লেখাপড়া জানেন দেখ্ছি, ছবিও আঁকতে পারেন!

আলোক বলিল—আর কি যে শোভা কি বল্‌ব দিদি! বিষাদে এত জ্যোতিঃ আর দেখি নি।

তবুও বড়রাণী বুঝিলেন না কেন আলোক চিঠিটা পড়িয়াই এত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, অথচ যে লিখিয়াছে তাহার জন্য শ্রদ্ধা ভক্তিতে অন্তরটি পরিপূর্ণ—একথা নিজ মুখেই সে প্রকাশ করিল।

আলোক ছেলেমানুষ, অস্থিরমতি এই ভাবিয়াই তিনি একটি নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

তিনি ত জানেন না, এই কিছুক্ষণ আগে এই তরুণীটি কি এক মর্ম্মন্তুদ কথা শুনিয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত শতবার মনে পড়িয়া বুকের ভিতরটা দাউ দাউ আগুণ জ্বালাইয়া দিতেছে। তবে সে বেশীক্ষণ নয়। যে মুহূর্ত্তে অজয়ের সংবাদ আনিয়াছে বলিয়া বিন্দু সংবাদ দিল সেইক্ষণেই তাহার মনে হইল সে সংবাদের জন্য তাহার এতটুকু আগ্রহও নাই এবং তাহার সংবাদ লওয়াটা অন্ততঃ এমন একজনের কাছে অতীব অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে যাহার তুষ্টিসাধনই তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃষ্ট কামনা।

সুরেন স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলে নাই। তবু সে যে এই ইঙ্গিতই করিয়াছিল তাহা বুঝিয়াই আলোকের মন বিষাক্ত হইয়া গেল।

বড়রাণী এ সবের কিছুই জানিতেন না—তিনি সরল প্রশ্নই করিলেন ফটো আছে?

আলোক বলিল—থাকে যদি, বাড়ীতেই আছে। আমার কাছে ত নেই।

বড়রাণী অল্পক্ষণ কি ভাবিয়া লইলেন, তাহার পর বলিলেন—তবে এক কাজ কর, চিঠির একটা জবাব দিয়ে দে যে তাঁরা খুজে নিন্। কিন্তু তাঁরা হয়ত সে সাহস করবেন না।

আলোক বলিল—তবে আমিই বা কি সাহসে তাঁদের সে কথা বলি!

বড়রাণী কহিলেন—তুই অক্লেশে বল্‌তে পারিস্। তুই বল্লে কার সাধ্য অমান্য করে। আর এক কাজ করলে হয় না আলো?

আলোক বিস্মিতমুখে জিজ্ঞাসিল—কি?

বড়রাণী বলিলেন—তুই সকালবেলা একবার যা, গিয়ে খুঁজে পেতে দেখে দিয়ে আয়! কি বলিস্? সেই ভালো নয়? তাঁরা অনাত্মীয় ভদ্রলোকের অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢুক্‌তে সাহস করবেন না, কিন্তু তুই যদি যাস……

আমি যদি তাঁদের লিখে দিই তবুও তাঁরা সাহস করবেন না?

আমার ত মনে হয় না। কিন্তু তোর যেতে একবার আপত্তি কি? ঠাকুরপো নেই তাই ভাবছিস, তা আমি বল্‌ছি—যা।

তবুও আলোক কথা কহিল না। বড়রাণী কিছুক্ষণ ধরিয়া উত্তরের

আশায় তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে কহিলেন—তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে আমি বল্‌ছি নে, আলোক। তবে আমার এই মনে হয় যে যদি কোন সময়ে তোর মার পেটের বোন্‌ বলে' তোর দিদির উপর একটুও শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল এ সময়ে কোন কারণেই তুই অজয়কে উপেক্ষা করতে পারিস্‌ নে। অন্ততঃ মানুষ বলে যদি পরিচয় নিজের দিতে চাস্‌ তা হ'লে করা উচিৎ নয়।—বলিয়া বড়রাণী ক্রমাগত তাহার দিকে চাহিতে লাগিলেন।

আলোক মুখটি তুলিয়া বলিল—উপেক্ষা করছি বুঝলে কেমন করে দিদি?

তাহার রুক্ষস্বরে বড়রাণী ব্যথা পাইয়া অধিকতর ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিলেন—তোকে আমিও মার পেটের বোনের মতন ভালোবাসি, সব কথাই সেই জন্যে জোর করে বলি। যদি রাগ করিস্‌ বলব না।

আলোক দাঁড়াইয়া উঠিল। দু'পা অগ্রসর হইয়া বড়রাণীর পাশে আসিয়া তাঁহার হাত দু'টি ধরিয়া কাতর স্বরে বলিল—না দিদি, রাগ নয়।—আরো অনেক কথাই যেন তাহার বলিবার ছিল, হঠাৎ কি ভাবিয়া সে থামিয়া গেল।

বড়রাণী জিজ্ঞাসিলেন—আলোক! ঠাকুরপো কি পছন্দ করেন না?

আলোক নতমুখে ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল—না।

বড়রাণী এই সন্দেহই করিয়াছিলেন। সুরেন, শুধু সুরেন কেন—এ বাড়ীর সকলেরই এমন শিক্ষা যে নির্ধন আত্মীয়ের আত্মীয়তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা সকলেরই পূর্ণ মাত্রায় আছে। কাজেই বড়রাণীর এমন আশা ছিল না যে দেবেন্দ্রকে বলিয়া কহিয়া ইহার কোনই

প্রতীকার করিতে পারিবেন। সুরেন তবু এদিকে ওদিকে 'বড় বড়' 'নামজাদা' কাজেও মাথা ঘামায়, তিনি যে সেই শয্যাত্যাগের সঙ্গেই দাবার ছক্ পাতিয়া বসিয়া আছেন, রাত্রি তৃতীয় প্রহরের এদিকে বাড়ীর লোকের সঙ্গে একেবারে নিঃসম্পর্ক। এমনই সে সখ্, বড়রাণীর বড় মেয়ে রমলার টায়ফয়েডের সময় ডাক্তার যখন শুষ্কমুখে রোগীর ঘর ত্যাগ করিল, ভৃত্য আসিয়া কন্যার জননীকে সংবাদ দিল, দশমিনিটের মধ্যেই বাবু আসিতেছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় রমলার রুদ্ধশ্বাস ফিরিয়া আসিল, জীবনপ্রবাহ পুনরায় বহিল, আধঘণ্টা পরে রমলার বাবা খেলায় শিবু ভট্টাচার্য্যকে 'মাৎ' করিয়া আসিয়া নিরুদ্বেগে বলিলেন এই যে রমলা আমার সেরে গেছে। অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে কি হইয়াছিল কেহই আবার সে কথা উচ্চারণ করিতেও সাহস করিল না, কন্যার পিতা ডাক্তারের মাসোহারা একশত মুদ্রা বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। কাজেই সে লোকের কাছেও আশা করিবার তাঁহার কিছুই নাই।

পত্র বাহক অনেকক্ষণ বসিয়া আছে, রাত্রি অনেক হইল এই ভাবিয়া বড়রাণী যেন অস্বস্তিবোধ করিতেছিলেন। বিন্দু পত্র দিয়া দরজার পাশেই অপেক্ষা করিতেছিল তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—বিন্দু, গাড়ী-খানায় খবর দেত, একখানা গাড়ী আমার এখনি চাই।—বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। মিনিট পাঁচসাত পরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন বিন্দু এসেছিল ?

আলোক বিবর্ণমুখে কহিল—না, এখনও আসে নি ত !

বড়রাণী অধীরভাবে খোলা জানেলায় মুখ বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া

রহিলেন। আলোক নিঃশব্দে তাঁহার পাশটিতে আসিয়া বলিল—দিদি, আমিই যাচ্ছি।

বড়রাণী সাহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন—তাই যা ভাই। তোর চেনা শুনো ঘরদোর, জিনিষপত্র, চট্ করে হ'য়ে যাবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, সত্যি মিথ্যে জানিনে, তবে শুনেছি পুলিস না-কি হুলিয়া করলেও যত্ন নিয়ে কাজ করে না। ওঁদের বলে দিস্ যার হাতে কেস্ পড়বে তা'কে যেন কিছু মোটামুটি রকমের কবলে দেন। আর আমাদের বল্লেই আমরা তা দিয়ে দেব

তার চেয়ে আমরাই কেন দিয়ে দিই না? ওঁরা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন্ তাঁকে।

না, না—তা'তে কাজ হ'বে না। আমাদের কাছে ঘুষও নেবে না, কাজও তেমনি তেমনি করবে। আর ওঁদের সাবধান করে দিয়ে আসিস আমাদের নামগন্ধও যেন পুলিসের কেউ জানতে না পারে। আর এক কাজ করলেও হয়—কিন্তু না, কাজ নেই।

সেই কাজটি কি জানিতে আলোক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল দেখিয়া বড়রাণী বলিল—আমি ভাবছিলুম একটা পুরস্কার জাহির করে দেওয়া যায় কি না! কাগজে দেখেছিস্ ত এমন প্রায়ই থাকে—অমুক লাল র‍্যাপার গায়ে, দোহারা চেহারা, গৌরবর্ণ লোক, নাম এই পলাতক যে সন্ধান দিতে পারিবে অত টাকা পুরস্কার পাইবে। দেখিস্ নি?

আলোক ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, দেখিয়াছে।

বড়রাণী বলিলেন—তা'তে কাজ কতদূর হয় জানিনে, তবে আর পাঁচ গোবেচারা কষ্ট পায়। ধর—গৌরবর্ণ চেহারা, লাল র‍্যাপার, এ ত

হাজার হাজার আছে, টাকার লোভে তাদের সব টানা হেঁচড়া করতে থাকে। শুধু তাই নয়, ঐ রকম পুরস্কার যাদের নামে বেরোয়—তারা যদি বা কোনদিন সংসারে ফিরে আসত. হৈ চৈ লোকলজ্জার ভয়ে কোন দিনই তাদের ফেরবার সাহস আর থাকে না।

এই সময়ে বিন্দু আসিয়া জানাইল, গাড়ী অন্দরের দ্বারে আসিয়াছে। বড়রাণী আলোকের সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া তাহাকে মোটরে তুলিয়া দিয়া বলিলেন—আমি বসে থাক্‌ব, আলোক। যত শীঘ্র পারিস, ফিরতে দেরী করিস নে।

আলোক সম্মতি জানাইল। বিন্দু আসিতেছিল, আলোক বলিল কিচ্ছু দরকার নেই, থাক্।—অনিল শোফেয়ারের পাশে বসিয়া রাস্তা দেখাইয়া চলিল।

—১৬—

আলোক নিশ্চয়ই জানিত, পাশের বাড়ীর সেই নোলকপরা বধূটি এবং তাহার অন্তরালে থাকিয়া বিধবা তাহাদের আশাপথ চাহিয়া আছেন। যে মুহূর্ত্তে বড়রাণী এখানে আসিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাহার পরিবর্ত্তে বড়রাণী গেলেও কাজ হয়ত সমানই হইবে কিন্তু তাহার না আসিবার কারণ অন্বেষণ এবং তৎসংক্রান্ত আলোচনাও হইবে। এ বাড়ীতে পা দিতেই দেখিল, কেরোসিনের ডিবাটি হাতে লইয়া টিপপরা বধূটি জানেলায় মুখ বাড়াইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ঠিক তাঁহার পশ্চাতেই শুভ্রবেশধারিণী বিধবাকেও সে দেখিতে পাইল।

বধূটি কলকণ্ঠে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়া বলিল—ঠাকুরপোকে পাঠিয়ে অবধি আমরা কেবলই মটর গাড়ীর ভেঁপু শুনছি। আমরা বলছিলুম রাত্রে হয়ত আপনি আর আসতে পারবেন না, কিন্তু দিদি ঠিক বলেছিলেন যে না তিনি আসবেন-ই।

আলোক তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—সত্যিই আসবার আমার উপায় ছিল না। কেবল……

বধূটি হাঁ করিয়া রহিল, আলোক থামিয়া গেল, কয় মিনিট পরে

আবার বলিল—আপনারাই ত ঘর থেকে একটা ছবি খুঁজে পেতে নিতে পারতেন।

বধূ বলিল—কি করে নেওয়া হবে বলুন? আপনার চাকরকে নিয়ে আমার ছোট ঠাকুরপো,—যে আপনাকে আন্‌লে··সব খুঁজেছে, কোথাও নেই—তবে বাক্সে টাক্সে থাকে যদি সে ত আর আমরা ভেঙ্গে চুরে দেখ্‌তে পারি নে। দেখা উচিতও নয়।

আলোক কতকটা আপন মনেই বলিল—নয় কেন? দেখ্‌লেই হ'ত! কি বা ধনদৌলত আছে যে আপনারা হাত দিলে খোয়া যেত!

সে কথায় আর বধূ উত্তর দিল না। বলিল—আচ্ছা—আপনার কি মনে হয়, তিনি সত্য সত্যই বিবাগী হ'য়ে যাবেন?

আলোক বিস্মিত নেত্রদ্বয় তুলিয়া চাহিয়া রহিল মাত্র, মুখ দিয়া একটি কথাও উচ্চারিত হইল না। তবে প্রশ্নটি এতই রুক্ষ কর্কশ যে মনের কোন একটি সুকোমল পর্দ্দায় এমন আঘাত করিল যে সে উত্তর না দিয়াই ঘরে ঢুকিয়া গেল।

সে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে মনে করিয়া রাধা ম্লানমুখে কি একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিতেই আলোক দোরের বাহিরে আসিয়া বলিল—সত্যিই আপনারা পুলিসে হুলিয়া করেছেন?

রাধারাণী বিমর্ষমুখে পশ্চাতে চাহিল, এবং সেই মুহূর্ত্তেই বিধবা মহিলাটি জানেলায় মুখ রাখিয়া বলিলেন—না, না—তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে' আমরা কি তা করতে পারি? তবে আমার ভাই পুলিসের বড় সাহেবের কাছে গেছল, সেই খবর এনেছে······

আলোক হঠাৎ মাঝখানেই অসহিষ্ণুর মত বলিয়া উঠিল - ছবি না পাওয়া গেলে কোন উপায় হ'বে না, কি বলেন ?

বিধবা বলিলেন—তা ত বলতে পারি নে ভাই, তবে না হওয়াই সম্ভব।

আলোক নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। এক মিনিটের জন্য সে ঘরটায় ঢুকিয়াছিল। ঢুকিতেই তাহার সমস্ত দেহমন যেন বিরক্ত তিক্ত হইয়া তাহাকে সেই কথাটাই মনে করিয়া দিল যে এই ঘরে বসিয়াই অতি প্রত্যুষে এমন কতকগুলি কথা সে বলিয়া ফেলিয়াছে, যাহার জন্য অজয় গৃহত্যাগী, এবং যে ঘরের সহিত তাহার বাস্তবিক কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া সগর্ব্বে চলিয়া গিয়াছিল সেই ঘরে এমন ভাবে আসিতে হইয়াছে ভাবিতেই মন যেন কী হইয়া গেল।

বিধবার করুণ কোমল কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল,—আলোক, তুমি একলা আছ—বল ত আমি যাই। - শুনিয়া আলোক বাহিরে আসিতে পারিল না। তিনি আবার ডাকিলেন, আলোক কেবল সংক্ষেপে বলিল —আসুন।

তারপর কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। আলোক সেখানে দাঁড়াইয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে যে কথাটি তাহার চিত্তাকাশে ভোরের শুকতারার মত জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল তাহা এই যে মানুষে মানুষে সম্পর্ক! যে-ই হোক, আত্মীয় অনাত্মীয় ধনী দরিদ্র স্ত্রী পুরুষ—সবই মানুষ এবং যেমন করিয়াই হোক কেহ কাহারো নিঃসম্পর্ক নহে। নহিলে ঐ যে ব্রাহ্মণ বিধবা.........

এই সময়েই পদশব্দ শুনিয়া আলোক তাড়াতাড়ি মুখ বাড়াইয়া দেখিল, ঠিক দ্বারের পাশেই তিনি দাঁড়াইয়া।

ভোরের যে আকাশে কেবলমাত্র দিনের শুভ্রতার বর্ণ-পাত হইতে-ছিল, অরুণোদয়ে তাহা যেমন সুস্পষ্ট সুন্দর হইয়া যায়, আলোকের মনে আর কোথাও কোন গ্লানি রহিল না। বয়সে বড়, মান্যে বড় বিধবা মেয়েটির হাত ধরিয়া ঘরে টানিয়া বলিল—এর ভেতরে কোথাও যে আছে তা বোধ ত হয় না।

পাশের ঘরেও ছিল না, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ছবি মিলিল না। আসবাব পত্রের মধ্যে দুইটি কাঠের বাক্স, একটা ভাঙ্গা তোরঙ্গ—এই মাত্র। বাক্সে কতকগুলি নিব, পিতলের দুই তিনটা মাদুলী, গোটা দুই ছুঁচ, একটা গুলিসুতা, আর একটা হইতে বাহির হইল, কুমুদের হাতের লেখা 'দৈনিক খরচের হিসাব বহি,' তোরঙ্গে থান দুই সুতাশেষ ধুতি—আর কিছুই নাই। দেওয়ালে ১৯২১ সালের ছেঁড়া একখানি ক্যালেণ্ডার, একটি মেমের মুখ আঁকা, অন্য দিকে পেরেকে ঝুলান একটি সযত্নরক্ষিত রক্তমাংসহীন অস্থিকঙ্কালসার ছত্রদণ্ড আব কড়িকাঠের কাছাকাছি পুরাতন কালীঘাটের ছাপা একখানি রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধ্যানমূর্ত্তি।

হতাশ হইয়া আলোক ব্যথাক্ষুব্ধ মুখে চাহিতেই স্নেহময়ী বলিলেন—নেই!

এই দু'টি অক্ষরের একটি অতিক্ষুদ্র কথাতে আলোকের বুক যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। এই 'নাই' কথাটির পশ্চাতে আর একটা বুক ভরা আশা যেন সঙ্গে সঙ্গেই উঁকি দিয়া বলিয়া উঠিল—নাই! নাই!

আলোক আর মুখ তুলিতে পারিল না। একপক্ষে না তুলিয়া ভালোই করিয়াছিল তখনি যে কথা সে শুনিল, তাহা যেমনই অভিনব তেমনি বিস্ময়কর।

স্নেহময়ী ধীর অথচ তীক্ষ্ণস্বরে কহিলেন—একটি কথা যদি সইতে পারতে আলোক, একমুহূর্ত্ত যদি আপনাকে সম্বরণ করতে পারতে, এ সবের কোনই দরকার ছিল না।—আবার কি অপরাধ করিয়াছে ভাবিয়া আলোক জোর করিয়া মাথাটা তুলিতে গেল, পারিল না। স্নেহময়ী আবার বলিলেন—তোমার সেই একটি কথা যে তাঁকে কত বেজেছিল সে তুমি তখন দেখ নি, কিন্তু আমি দেখেছি। তোমার মোটর ভোঁ ভোঁ শব্দ করে চলে গেল, আর এই দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন ঘরে ফিরলেন, চোখের জলে বুকখানা ভাস্‌চে। তার একটু পরেই......

আলোক আস্তে আস্তে বলিল—একটা কথা বল্‌ব?

কি – বলিয়া বিধবা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চিঠিতে আপনি লিখেছিলেন, অজয় বাবুকে আপনি দেখেন নি...

স্নেহময়ী সকরুণকণ্ঠে কহিলেন—আমি কি মিথ্যে বলেছি বোন্! না আলোক, আমি সত্য কথাই বলেছি। আর এখন যা বল্লুম, এ ত দেখে বলবার কথা নয়। এ-যে জানা কথা! তোমার কথাগুলো শুন্‌লুম শেষটা যে কী হ'ল, তা আর বুঝতে পারব না। আর রাধা ত দেখেওছে।

অন্যায় আমি কী বলেছিলুম?

অন্যায় হ'য়েছিল বৈ কি। তুমি যে এমন নির্দ্দয়ভাবে কথা বলতে পারো এ তাঁর জানা ছিল না বলেই ব্যথাটা বড় বেশী বেজেছিল। সত্যিই

তুমি কিছু চিরদিন এখানে থাক্‌তে না, কিন্তু শোকে দুঃখে যখন লোকটা তোমারই মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তখন তাকে অমন করে বলা কিছুতেই উচিৎ হয় নি। তারই অবহেলা সব চেয়ে বেশী বাজে বোন্, যাকে মানুষ সব চেয়ে আপনার ভাবে; যার আশায় নিঃস্ব রিক্ত বুকে পথ চেয়ে পড়ে থাকে। তোমার অবহেলা তাকে এমনি করেই বেজেছিল, নইলে কেন গৃহত্যাগ করবেন ?

আলোকের কান মাথা ভোঁ ভোঁ করিয়া সব যেন এলোমেলো করিয়া দিতেছিল। এত বড় অপবাদের একটা ক্ষুদ্র প্রতিবাদ করিবার শক্তিও তাহার ছিল না। সে নিশ্চল প্রতিমূর্ত্তির মত নিজের পদনখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

স্নেহময়ী পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন—তোমার হয়ত সত্যিই অসহ্য হয়েছিল কিন্তু সেই কথাটি যদি সহ্য করতে পারতে বোন্, দুদিন পরেই সব ঠিক হ'য়ে যেত। তোমারও আপনার লোকের কাজ করা হ'ত।

আলোক আড়ষ্ট মুখটি তুলিয়া বলিল—আমি না-হয় আপনার লোক না হ'তেই পারলুম। আপনি ত জেনেওছিলেন, সব কথা শুনেওছিলেন, আপনি কোন্ তাঁকে আটকে আপনার জনের কাজ করলেন।

তাহার রোষ-ক্ষুব্ধস্বর স্নেহকে যথেষ্ট আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু ইহাপেক্ষা কোন্ এক অগ্নিকুণ্ডের আগুনে হৃদয়ের মত কাঁচা মাটিও তাঁহার পুড়িয়া ইঁট হইয়া গিয়াছিল, হাসিমুখে সে আঘাত বুক পাতিয়া লইয়া বলিলেন—পোড়ার মুখ যে দেখাবার নয় নইলে কি তাও করতুম না বোন্! তাও করতুম! গরীবের ব্যথা গরীবই বোঝে! আমার ছোট

ভাইটি তাঁকে ফেরাবার জন্যে ঢের চেষ্টা করেছিল কিন্তু যে আগুন তুমি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছ সে আগুন নিবোবার ক্ষমতা আমরা কোথায় পাব?

আলোক নিস্পন্দ অসাড়। যে চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে সুনির্জ্জনে নিজের নিষ্ফল ব্যর্থ জীবন বহন করিয়া আসিয়াছে; পৃথিবীর নিদারুণ শোক দুঃখের তাপে অঙ্গার হইয়া গিয়াছে, তাহার পরদুঃখ-কাতরতা, পরহিতাকাঙ্খা যত বড় উচ্চহৃদয়ের পরিচয় দিক্, আলোক যেন তাহারই মধ্যে কি একটা হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। অথচ তাহার মধ্যে যে কি পাইবে, কিম্বা সত্যই কিছু আছে কি-না তাহাই সে জানে না!

ওপাশের বাড়ীর দ্বিতলের ঘরে ইলেক্ট্রিক বাতি জ্বালাইয়া একটি ছেলে পরীক্ষার পড়া তৈরী করিতে করিতে ঘুমাইয়া গেল, তাহারই ঘরের ঘড়িটায় ঠং ঠং করিয়া বারোটা বাজিতে শুনিয়া স্নেহময়ী সচকিতে দাঁড়াইয়া বলিলেন—পাওয়া ত গেল না, কি করবে আলোক?

আলোক বলিল—তা বল্‌তে পারি নে। রাত ১২টা বেজে গেছে, আপনি বাড়ী যাবেন?

তুমি কি এখন থাক্‌বে?

তাও ঠিক জানিনে, তবে কিছুক্ষণ থাক্‌তেও পারি।—সে যে বিরক্ত হইয়াছে, এবং কাটিয়া ছাঁটিয়া যে কথা কয়টি বলিল, তাহার মধ্যে নারীত্ব ছিল না বলিয়াই স্নেহময়ী অতি নিকটে আসিয়া আলোকের চিবুকস্পর্শ করিয়া সুকোমলকণ্ঠে বলিলেন—আলোক তুমি রাগ করলে ভাই!

আলোক সাড়া দিল না।

স্নেহময়ী পুনশ্চ কহিলেন—আমার উপর সত্যিই তুমি রাগ করলে? কথা কবে না? কয়ো না, কিন্তু একদিন এর জন্য তুমিও দুঃখ পাবে। এই দুটি তিনটি দিনের আলাপেই তোমাকে আমি ছোট বোনটির মতই ভালো বেসেছি—বুকে তুলে নিয়েছি—এ কথাটি আমার তুমি অবিশ্বাস করো না। আর আজ যদি না বিশ্বাস করতে পারো একদিন পারবে বোধ হয়, যেদিন বুঝবে এই পোড়া কাঠের মত বুকখানায় যা কিছু আছে কেবলই ভালোবাসা কেবলই স্নেহ যেদিন বুঁঝবে এর একটি বর্ণও অতিরঞ্জন নয়—সেদিন কিন্তু দিদি বলে আসতে দ্বিধা করো না। আজকের এ অভিমান সেদিন থাকবে না সে আমি নিশ্চয় বলতে পারি—তবে লজ্জা হ'তে পারে, কিন্তু সে লজ্জাই বা কার কাছে—দিদির কাছে বোনের লজ্জা!

তাহার কথা শেষ হইবামাত্র আলোক তাঁহার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কিন্তু একটি কথাও কহিতে পারিল না।

স্নেহময়ী সাদরে পুনরায় আলোকের অধর স্পর্শ করিয়া কহিলেন—আমি যাই বোন্—খোকার দুধ খাবার সময় হ'য়েছে। সে আবার আমার কাছ ছাড়া একটি ঝিনুক-ও খায় না।

বড়রাণীর মেয়েকে দশটার মধ্যে রাত্রের মত শেষ খাওয়ানো সম্পন্ন হইয়া যাইত—আলোক তাহা জানিত, সেই নিয়মেই হিসাব করিয়া বলিল - বৌ-র খোকা! এত রাত্রে দুধ খাবে?

স্নেহময়ী সহাস্যে বলিলেন—না খেলে এ বুড়ো রাত্ কাটে কি করে' বল? ঐ কচি বৌ—সেই বা সামলাবে কেমন করে? সমস্ত দিন এই সংসার ঠেলা, তার ওপর······

কথার শেষটা পর্য্যন্ত যেন বুঝিতে পারিয়াছে এমনই ভাবে আলোক বলিল—আমি বলছি বারোটা বেজে গেছে—তাই।

এই রকম সময়েই খায় বলিয়া স্নেহ প্রস্থানোদ্যত হইলেন। মান নাই, অভিমান নাই, শোকদুঃখও যেন স্থান পায় না এমনই ভাবে স্নেহ স্নেহ-হাস্যে ঘরের বাহির হইয়া গেল। সেই সঙ্গেই আলোকের মন যেন একেবারে ভূতলে আছাড়িয়া পড়িল। ছুটিয়া আসিয়া স্নেহময়ীর পা দুটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—দিদি, আমাকে তুমি ক্ষমা করবে বল?

স্নেহময়ী তাহার হাত ধরিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন, বলিলেন—রাগ হ'লে তবে ত ক্ষমা! আমি ত রাগই করি নি আলোক! রাগ যে আমার করতে নেই। রাগ বিরাগ অনুরাগ সবই যে এক দিনে এক সঙ্গে এক চিতায় জ্বালিয়ে দিয়েছি বোন্। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দু'টি ছল ছল করিয়া উঠিল। কেবলমাত্র চোখের জল গোপন করিতেই যে তিনি দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন, তাহা বুঝিয়াই আলোকের শ্রান্ত ক্লান্ত চোখ দুটি কেমন আপনাআপনি মুদিত হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নারীবধের সর্ব্বাপেক্ষা সুতীক্ষ্ণ তূণ নিক্ষেপ করিতেও যে সে দ্বিধা করে নাই—তাহারই অনুশোচনায় একেবারে মরমে মরিয়া গেল। দশমিনিটের মধ্যেই বিগত জীবনের মত ঘটনাগুলি একে একে বর্ষার ঘন মেঘের মত আলোকের বুকের পরে জমিয়া বসিতে লাগিল। ক্রমাগত ক্রমাগত সংঘর্ষনে যে বিদ্যুৎ দিগন্ত চকিত করিয়া তীব্র আলোকে তাহার দুঃখভার পীড়িত, দরিদ্রের জীর্ণ কুটির খানির মত বুকটিকে কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল, তাহা এই, যে অজয়কে সে-ই বিদায় করিয়াছে। শোকোপমোদন করিতে আসিয়া দর্পিতা অহংকৃতা নারী তাহাকে

জন্মের মত গৃহছাড়া করিয়াছে। অজয়ের গৃহের আকর্ষণ কুমুদের সঙ্গেই তিরোহিত হইয়াছিল, তবুও যে আলোকের মুখ চাহিয়া সে কুমুদহীন সেই গৃহে আসিয়াছিল– বাস করিবে বলিয়াই। সেই তাহাকে বিদায় করিয়াছে।

মনের বিকারই হোক, অথবা শ্রান্ত ক্লান্ত মনের দুর্ব্বলতাবশতঃই হোক, বহুদিনের সুখ দুঃখের জীবনের অনুতে পরমানুতে মিশ্রিত গৃহের মায়াতেই—আলোকের যেন বোধ হইতে লাগিল—কুমুদ তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। সে যে আকুল তৃষায় কাহাকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে বুঝিতে পারিয়াই আলোকের হাত পা অবশ হইয়া গেল। এবং কুমুদের স্থির ভাস্বর দৃষ্টির আগুনে পুড়িয়া ছাই হইবার আগেই দু'টি হাত মুখে চাপিয়া উপুড় হইয়া আছাড় খাইয়া পড়িল।

—১৭—

হাওড়ার পুলের মাঝামাঝি আসিয়া সুরেনের গাড়ী আর অগ্রসর হইতে পারিল না। সামনে কি হইতেছে, কেন এত রাজ্যের গাড়ী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেছে জানিবার কোনই উপায় নাই—সুরেন ক্রমাগত হাতে বাঁধা ঘড়িটা দেখিতে লাগিল। সময় যতই কমিয়া আসিতেছিল সে ততই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল। শেষে সে আর থাকিতে পারিল না। নামিয়া পড়িয়া কি ব্যাপার দেখিতে গেল, তাহাতেও কৃতকার্য্য হইল না। বিদ্যুতের তীব্র আলোকে যতদূর নজর চলে কেবল গাড়ী আর কেবল মাথা! এক পা নড়িবার যো নাই।

কিন্তু তাহাকে যে যাইতেই হইবে। না যাইলে চলিবে না! কেবল যে দিল্লীতে তার করিয়া খবর পাঠাইয়াছে সে জন্য নয়, দিনকতক বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার তার আবশ্যক হইয়াছিল। কেন সে তাহা নিজেই জানিত না। আলোক-কে কাঁদাইতে কি? তাহার বিরহে আলোক কেমন থাকে, তাহাই জানিতে কি? আলোকের যে তীব্র উগ্রতার ঝাঁজে সে জ্বলিয়া পুড়িয়া আসিতেছে—তাহাই দমন করিবার জন্য সে-যেন এই পথটাই সমীচীন বোধ করিয়াছিল।

এই নারীজাতিটাকে প্রশ্রয় দিলে তাহারা যে কোথায় উঠিয়া পড়ে,

তখন যে আর তাহাদের উচ্চনীচ কোন বিচার বোধ থাকে না, এই সব বহু পুরাতন প্রবাদ বচনগুলি আওড়াইতে আওড়াইতে সে বাড়ীর বাহির হইয়াছিল। আর কিছুক্ষণ বাড়ীতে থাকিলে হয় ত সমাজের কল্যাণকামী, দেশের নেতৃপদাভিলাষী যুবকের মুখের খোলসটা খসিয়া পড়িয়া আসল চেহারাটাই বাহির হইয়া পড়িত। সেই-টা যে না ঘটিয়াছে—সুরেন তাহাতে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। সে হইলে ঘরে বাহিরে তাহার মুখ দেখানো দুঃসাধ্য হইত! ঘরে সে চিরদিন দেশহিতৈষীর মুখস পরিয়াই কাটাইয়া আসিয়াছে, সাংসারিক ক্ষুদ্র. বৃহতের দিকে যেন নজরই ছিল না, হঠাৎ একটা বিশ্রী কাণ্ড হইয়া গেলে ঘরের লোক ধরিয়া ফেলিত! আর বহিরের ত কথাই নাই। দুর্ম্মুখ বাঙ্গালা কাগজের এমন সব সম্পাদকের অভাব নাই যাদের কাছে সেই সাংসারিক তুচ্ছতাই পরম উপাদেয় রসনাতৃপ্তিকর সুখাদ্য হইয়া উঠিত! আর পয়সা দিয়া সেই কুৎসা শুনিতে ও পড়িতে বাঙ্গালা দেশে পাঠকের যে কত আগ্রহ তাহা কলকাতার পথে ঘাটে ফেরিওলাদের মুখে কে-ই বা না শুনিয়াছে।

এমনও দেখা গিয়াছে, অমুক বাবু গাঁজা খাইয়া গাল দিয়াছেন, আজ আর কেহ বাদ যান্ নাই—শুনিয়া কাগজ না কিনিলেন, আফিস ফেরৎ এমন একটি বাবুও ট্রামে রহিলেন না! এমন রসাল সংবাদ যে অতি সুলভ মূল্যে হাতে হাতে ফিরিত, জানিয়াই সুরেন নিজের মনে বারবার বলিল—উঃ খুব রক্ষা হইয়াছে।

বাস্তবিক সুরেন অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়াছিল! সে ত জানিত না যে আলোক ভাবিয়া চিন্তিয়া গুছাইয়া মাজিয়া কোন কথাই

বলে নাই। কোন অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন কথাই যেমন মাতালের মুখে বাধে না, আলোকের মুখ দিয়া যে সে সব কথা বাহির হইয়াছে, তাহার বিন্দু বিসর্গও তাহার মনের গোচর ছিল না। সে-ই যে তাহাকে মাতাল করিয়া দিয়াছিল, তাহার কথার বিষে আলোক আপনাকে সে সম্বরণ করিতে পারে নাই—এ সব ভাবিবার মত ধৈর্য্য তাহার ছিল না। তাই সে আলোককে শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে।

গাড়ীর আধঘণ্টা দেরী আছে, সুরেন হরে'কে ব্যাগ লইতে বলিয়া ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইল। অন্যান্য জিনিষপত্র আগেই সরকার ম'শায় লইয়া ষ্টেশনে গিয়াছেন।

অতিকষ্টে ভিড় ঠেলিয়া সে যখন ষ্টেশনের বাহিরে বড় রাস্তাটায় আসিয়া পড়িল ব্যাপারটা কি স্পষ্ট জানিতে পারিল। সংখ্যায় কত ঠিক জানা গেল না, কিন্তু ইহা বুঝা গেল, ভারতবর্ষের যেখানে যত দীন দরিদ্র কঙ্কালসার ভিক্ষুক-পরিবার ছিল সব যেন একত্র করিয়া একটা বিরাট ভোজের বাড়ীর সামনে আনিয়া ছাড়িয়া দেছে। কোথায় ছিল এত লোক! তখন মনে পড়িল, আসামের চা বাগানের কুলী—ইহারা। রাস্তায় তিল পড়িবার স্থান নাই, দুর্গন্ধে ভরিয়া উঠিতেছে—ভিড়ের মাঝে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া পুলিস-ম'হাশয়গণ নিজেদের অস্তিত্ব এবং কৃতিত্ব বজায় রাখিতেছেন। কিন্তু সে-সব ছাঁপাইয়া, যে ধ্বনি গগন বিদীর্ণ করিয়া উঠিতেছিল, কী সে হৃদয়ভেদী হাহাকার! উদরে অন্ন নাই, পরনে কৌপীনও নাই, দেহে কেবল মাত্র সাদা হাড়গুলাকে ঢাকিয়া রাখিতে কালো চামড়াটা আটকাইয়া আছে—সুরেন কিছুতেই তাহাদের

ঠেলিয়া পথ করিতে পারিল না। অদূরে একজন কনেষ্টবল দাঁড়াইয়া একটি কুলিরমণীর সহিত হাসিয়া হাসিয়া আসামের চা বাগানের ইতিহাসটা শুনিয়া লইতেছিলেন, সুরেন তাহাকেই ডাকিয়া বলিল—বাপু তোমাকে আচ্ছা বখসিস্ দেব, আমাদের এই ভিড়টা যদি পার করে' দাও।

সর্ব্বশক্তিমান পুলিস-দেবতা 'সিন্নীর' নামে সন্তুষ্ট হইয়া সম্মত হইলেন—নব পরিচিত কুলীরমণীটিকে এখনি আসিবেন এই অভয় দিয়া সুরেনের হাত ধরিয়া রুলের গুঁতায় জরাজীর্ণ কুলীদের অস্থিচর্ম্ম বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন।

হাওড়া ষ্টেশনের রেলিঙ ঘেরা অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া সুরেন হাত ঘড়িটা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। ৮-৩৩! ৮-৩০শে পাঞ্জাব মেল ছাড়ে। সুরেন বিমর্ষ ম্লানমুখে ষ্টেশনের মিনারের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া হিসাব করিয়া দেখিল ৮-৩৩! ঊর্দ্ধশ্বাসে কয়েকপা আসিতেই তাহার সরকার মহাশয় নিকটে আসিয়া কহিলেন—গাড়ী ছাড়িয়া গেছে।

যেন শুনিতে পায় নাই এমনই ভাবে সুরেন অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ সামনে একদল লোক দেখিয়া থামিয়া গেল। সেখানে ব্যাপারটা যে গুরুতর গোছের কিছু—তাহা সে একদৃষ্টিপাতেই বুঝিতে পারিয়াছিল। মস্ত লম্বাচৌড়া একটা সাহেব রঙ বেরঙের জামাজোড়া আঁটিয়া কাল একটা টুপি মাথায় দিয়া খুব হাত মুখ নাড়িয়া একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোককে তিরস্কার করিতেছে। দূর হইতে যা দুই একটা কথা সুরেন শুনিতে পাইয়াছিল—তাহাতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠিল। সে

একেবারে সাহেবটার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তাহার ইংরাজী বেশ, মুখে চুরুটিকা—সাহেব তাহাকেই সম্বোধন করিয়া বলিল—মজা দেখিতেছ! ষ্টেশন-কম্পাউণ্ডে এই সব রুগ্ন কুলীদের প্রবেশ করাইয়া ইঁহারা যাত্রীদের অসুবিধা ঘটাইতেছেন।

সুরেন বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—কি ব্যাপার মশায়?

ভদ্রলোক কয়েকটি রোগীর পরিচর্য্যা করিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়াই বলিলেন—ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়।—পরে সাহেবটার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, আমি তোমায় বরাবর বলিয়াছি তুমি আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিও না। তুমিও মানুষ, এই সব মরণোন্মুখ দুঃখীরাও মানুষ। ইহাদের জন্য তোমার দুঃখিত হওয়া উচিৎ।

সাহেব মহাআস্ফালনে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া হাত তুলিয়া বলিল—দুঃখিত! আমার হাতে পুলিস ফোর্স থাকিলে এতক্ষণ আমি ঐ জঘন্য জীবগুলিকে নদীর জলে ফেলিয়া দিতাম।

ভদ্রলোক হাসিলেন, বলিলেন—পুলিস ফোর্স না থাকায় তোমারই মঙ্গল হইয়াছে। যেহেতু তাহা হইলে তোমাকেই সর্ব্বপ্রথম নদীর জলে দেহরক্ষা করিতে হইত।

সাহেব একবারে আগুন হইয়া উঠিল। হাত পা তাহার কাঁপিতেছিল। আরক্তমুখে একজন টিকিট কালেক্টারকে ডাকিয়া রেলওয়ে পুলিস-সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে পাঠাইয়া দিতে বলিয়া সেই ভদ্রলোকটিকে কহিল—আমাদের আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার অপরাধে সর্ব্বপ্রথম আমি তোমাকেই পুলিসে দেব।

সাহেব সুরেনের দিকে ফিরিল। তাহাকে সে নিশ্চয়ই হিতাকাঙ্ক্ষী ভাবিয়াছিল। বলিল—আজকাল এই সব হুজুগ বড় বেশী হইয়াছে। নিদ্রিত গভর্ণমেণ্ট যে কি করিতেছেন, কিছুই বলা যায় না—বলিয়া বীর পুঙ্গব অগ্নি দৃষ্টি বৃষ্টি করিয়া ভদ্রলোকটিকে পুড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন! কিন্তু হায়! কলির মহাদেব-মুর্ত্তি সাহেবেরও হয়ত জানা ছিল না যে মদন ভস্মের যুগ এ নয়। লাল মুখের চোখের আগুনে ভারতবাসী পুড়িবে না। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তবুও ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবী পরা বাঙ্গালীটি পুড়িল না, এমন কি, তাহার জামাটাতেও আগুন ধরিল না দেখিয়া সাহেব হয়ত নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া কালো কুর্ত্তিপরা একটা কুলাকে রক্ত চক্ষে কহিলেন—কেঁও শালা বদমাস্, খাড়া কাহে? জল্দি দেখো পুলিস সাহেব আতা কি নেহি? —কুলী সত্যই কোথায় গেল বলা যায় না, তবে সাহেবের দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকাটা সে যুক্তিযুক্ত বোধ করিল না।

ভদ্রলোকটির তিনচারিজন সহকারী ভূশায়িত কুলীদের সেবা করিতেছিল, ভদ্রলোক তাহাদেরই একজনকে কি বলিয়া কোথায় পাঠাইয়া দিলেন। পরে বলিলেন—সাহেব তুমি কি মনে কর, যে চোখ রাঙাইয়া পুলিসের ভয় দেখাইয়া আমাদের কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে! তা যদি মনে করিয়া থাক ভুল করিয়াছ, সাহেব ভুল করিয়াছ। তোমার মত অনেক সাহেব আমার মোটর গাড়ী চালায়—বুঝলে? বেশী গোলমাল কর' না—আস্তে আস্তে বাড়ী যাও—নইলে এর পরে যা ঘটবে—তার জন্য আমি দায়ী নহি।

রাগে সাহেবের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে ক্রমাগত এদিকে ওদিকে চাহিয়া কি খুঁজিয়া মরিতে লাগিল।

ভদ্রলোক শান্ত অথচ তীব্র কণ্ঠে কহিলেন—তোমাদের কোম্পানীর বড় সাহেবদের, দার্জ্জিলিঙে লাটসাহেবকে আমি তার পাঠিয়েছি এই কুলীদের গাড়ীর বন্দোবস্ত করতে। তার যতক্ষণ না একটা ব্যবস্থা হ'চ্ছে ততক্ষণ আমরা তোমার কম্পাউণ্ড ছেড়ে কোথায় যাবো না—সাহেব। মিছে চেষ্টা।

সাহেব গর্জ্জন করিয়া বলিল—ড্যাম্! তুমি যাইবে কি না?······

সাহেব আরও কি বলিতেছিল, সুরেন তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—খবর্দ্দার!

সাহেব হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া কহিল—হাত ছাড়! তুমি ভদ্রবেশী পশু······মুখের কথা মুখেই রহিল। সাহেব গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

অতবড় সাত ফুট লম্বা, শূকর-গো-মাংসে পুষ্ট বৃহদকায় বীরকেশরী ক্ষুদ্র বাঙ্গালী—শাকান্ন ভুক্ বাঙ্গালীর হাতের এক চপেটাঘাতে একেবারে ধরাশায়ী হইল।

সুরেন ভদ্রলোকটির হাত ধরিয়া বলিল—আর নয়, যথেষ্ট হইয়াছে।

দূর হইতে যাহারা সাহেব বাঙ্গালীর বাক্-যুদ্ধ দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই আশু বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া চট্‌পট্ সরিয়া পড়িল। কেবলমাত্র যুবকদল বুক ফুলাইয়া ভিড় করিয়া আসিল। সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া রেলের

কর্ম্মচারীদের ডাকিতে লাগিল। কিন্তু হায়! বিপদ কালে অনেক বন্ধুই যাহা করিয়া থাকে, তাহার একান্ত বিশ্বাসী অনুগত ভক্তগণও তাহাই করিল। ভিড়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া পরম মিষ্ট সম্ভাষণে তাহাকেই সম্বোধন করিতে লাগিল!

ভদ্রলোক সুরেনের দিকে চাহিয়া কহিলেন—বেটাদের স্পর্দ্ধা দেখ্‌লেন ত! ব্যবহারটাও দেখলেন। এই যে পাঁচ সাতহাজার লোক—পেটে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নাই—যাদের দেখ্‌লে অতি বড় পাষণ্ডেরও বুকফেটে যায়—কি-না তাদের মধ্যেই অসুস্থ যারা—তাদের একটু বসাবার শোওয়াবার জায়গা দিতে বলেছি ওঁর মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হ'য়ে গেছে। বেটাদের খুন করলেও রাগ যায় না।

সাহেব বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ মানচিত্রেই দেখিয়াছে, এই দেশেরই চিংড়ী মাছ পুঁইশাক খাইয়া এত বড় হইয়াছে—বরাত জোরে মেম-টা জুটিয়াছিল ভালো, স্ত্রীভাগ্যে ধন,—রেলের বড় বড় সাহেব অবধি খাতির করিল—সাধারণ বাঙ্গালীর মতই 'সাহেবের' বাঙ্গালা জ্ঞান অল্প ছিল না, সমস্তই বুঝিয়া, বলিল—কে কাহাকে খুন করে, এখনি বুঝিতে পারিবে।

ঠিক সেই সময়ে পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট লোকজন সমেত আসিয়া হাজির হইতেই সাহেব বিনাইয়া বিনাইয়া বলিবার আয়োজন করিতেছে, সুপারিনটেনডেণ্ট একেবারে টুপি খুলিয়া হাত বাড়াইয়া দিল—তাহারই দিকে—যাহার হাতের তেজ সাহেবের গালে তখনও ফুটিয়াছিল।

হা ডু ডু মিঃ সেন্—বলিয়া ফোর্থ সাহেব ভদ্রলোকের করমর্দ্দন করিয়া অন্য সাহেবটির দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন—কি হইয়াছে?

সে আর তখন কি বলিবে! যা বলিল, খানিকটা শুনিয়াই ফোর্থ

সাহেব মিঃ সেনের পানে ফিরিয়া বলিলেন—মিঃ সেন, এই হতভাগ্য কুলীদের জন্য কোনও উপায় কি আপনি চিন্তা করিয়া বাহির করিয়াছেন ?

মিঃ সেন বলিলেন— আমি গভর্ণর ও রেল অথরিটিদের তার করিয়াছি। যতক্ষণ না ইহাদের গাড়ী দিয়া দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে—আমি এই রুগ্ন পীড়িত লোকগুলিকে এইখানেই রাখিয়া সেবা সুশ্রূষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। অবশ্য হাওড়া ব্রিজের ওপর হইতে ফটক অবধি যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা আপাততঃ ঐ রকমই থাক্—তাদের জন্যে কিছু করা এখন সম্ভব নয়। আমরা শুধু পীড়িত আর্ত্তদের জন্য যথাসম্ভব একটু কার্য্য করিতে চাই।

ফোর্থ সাহেব প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—আপনারই অনুরূপ কার্য্য করিতেছেন। মিঃ সেন, যদি আমার দ্বারা সাহায্য সম্ভব হয় আমি যথাসাধ্য করিতে প্রস্তুত আছি।

মিঃ সেন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন—আপনি কেবল এইটি দেখিবেন—কেহ যেন আমাদের কার্য্যে বাধা না দেয়।

ফোর্থ সাহেব বলিলেন—না, না, আপনাকে বাধা দিবে—এমন লোকও আছে নাকি ?

যে সাহেবটি তখন কেবল মুখের মধ্যে আঙ্গুল পুরিয়া বমনোদ্যোগ করিতেছিল, তাহার দিকে ফিরিয়া ফোর্থ সাহেব জিজ্ঞাসিলেন—জেমস্ ইহাকে কি তুমি চেন ?

সাহেব গোঁ হইয়া বলিল—নো !

ফোর্থ কহিলেন—আশ্চর্য্য ! এস জেমস্, তোমাকে এই মাননীয়

ভদ্রলোকের সহিত পরিচিত করিয়া দিই। তিনি ভারতসভার মাননীয় সভ্য মিঃ ভূপতিনাথ সেন, আর ইনি এখানকার অধ্যক্ষ মিঃ জেমস্!

জেমস্ বাধ্য হইয়া হাত বাড়াইয়া দিল। মিঃ সেন সহাস্যে নাড়িয়া দিলেন।

একটু ক্ষমা করুন, একস্‌প্রেস ছাড়িবার সময় হইয়াছে—বলিয়া জেমস্ পলায়ন করিল।

সুরেন ভূপতি সেনকে চিনিত না। তবে সেই ছিল ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহার একমাত্র ক্ষমতাশালী প্রতিদ্বন্দ্বী! ভূপতি অনেকদিন হইতে সভ্য ছিলেন—এ বছরও দাঁড়াইয়াছেন—সুরেন তাঁহারই বিপক্ষে লোক ভাঙ্গাইতে আজই সন্ধ্যাবেলা নরেশ ঘোষকে একরাশ টাকা দিয়া আসিয়াছে।

আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল—ওঃ সে কি ভুলই করিয়াছে! ভূপতি সেনই রাজসভায় দাঁড়াইবার যোগ্য একমাত্র ব্যক্তি। সূর্য্য-রশ্মির প্রতি নয়ন রাখিয়া অন্য যাবতীয় আলোর কল্পনা করাই যেমন হাস্যাস্পদ—ভূপতির দিকে চাহিয়া চাহিয়া সুরেন আপনাকে কোনমতেই তাহার সমকক্ষ বলিয়া ভাবিতে পারিল না। সে শুধু মনের জোরে, বাগ্মীতায় বড় নয়—গায়ের জোরে, পরদুঃখকাতর হৃদয়ের গুণে ভূপতি যে কত উঁচে—আজ সুরেন যেমন করিয়া চাক্ষুষ দেখিল, এমন করিয়া বোধ করি এ জীবনে সে কাহাকেও দেখে নাই! ভূপতি যখন প্রবল চপেটাঘাতে সাহেবটাকে ভূপাতিত করিয়াছিল, তখন (সে ভূপতিকে চিনিত না) সুরেন কার্যটি সঙ্গত বিবেচনা করে নাই। এখন মনে হইল, না, ভূপতি ঠিকই করিয়াছে। লাঠ্যৌষধি অনেক রোগীর পক্ষে

প্রকৃষ্ট মহৌষধি! অন্ততঃ এখনি তাহার ফল অতি উত্তমরূপে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

হাজার করা একটি বাঙ্গালীও এ দুঃসাহসের কথা কল্পনাও করিতে পারে না। কাগজে লিখিতে বলিলে দেড় কলম প্রবন্ধ লিখিয়া জেমসকে বনবাসে পাঠাইয়া দিতে পারিত; বক্তৃতার জোরে তাহাকে হয়ত ভারত সমুদ্রের অতল তলে ডুবাইয়া দেওয়াও অসাধ্য হইত না, কিন্তু এমন 'অভদ্র' ভাবে গায়ে হাত তুলিতে সেই হাজারের একজনও পারিত কি-না সন্দেহ!

ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে সুরেন গায়ের জোরে ইংরেজের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া লড়াইয়ের আহ্বান করিতেছে। তাহা নয়—সে যাহা বলিতে চায় তাহা এই যে কেবল চামড়ার শুভ্রতার দোহাই দিয়া যে সব মূর্খ এই দেশবাসীর উপর চোখ রাঙাইয়া চলিবার স্পর্দ্ধা রাখে তাহাদের একটু আধটু সমঝাইয়া দিতে যদি গায়ের জোর দেখাইতে হয়—তাহাতে অভদ্রতা নাই। তাহা হইলে হয়ত সুসভ্য বিলাতী সম্বোধনগুলি ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালীর হাতের তেজটা তাহাদের স্মরণে থাকিবে।

ফোর্থ সাহেব সিভিলসার্জ্জনকে খবর দিতেছি বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেই সুরেন ভূপতির নিকটে আসিয়া পুলকিত স্বরে কহিল—ভূপতি বাবু! আমাকেও আপনাদের কোন কাজে লাগিয়ে দিন্! যদি কোনদিন আপনার বিরুদ্ধাচরণ করে থাকি আজ আমি আপনার একান্ত আনুগত্য স্বীকার করছি।

ভূপতিও তাহাকে চিনিতেন না। তাঁহাকে সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সুরেন বলিল—আমার নাম······ইত্যাদি!

ভূপতি সাহ্লাদে কহিলেন—আপনারও আজ দিল্লী যাবার কথা ছিল না ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ট্রেণ ফেল।

আমারও যাবার কথা ছিল, পথে এসে এই বিপদ। ফেলে কি করে যাই বলুন! আহা, বেচারাদের কষ্ট দেখলে বুক ফেটে যায়।...... তা আপনি কাল যাচ্ছেন না-কি ?

না।

ভূপতি বলিল—আমাকে বোধ হয় কাল যেতে হ'বেই। অবশ্য তার আগে যদি এদের ব্যবস্থা করতে পারি। আপনি কবে যাচ্ছেন তবে ?

সুরেন হাসিয়া কহিল—আর কোনদিনই আমি যাব না, ভূপতি বাবু! দিল্লীর লোভ আর আমার নেই। দেশের যে সমস্ত আর্ত্ত, পীড়িত অন্নহীন গরীবদের তাড়িয়ে এখানে ঢুকতে পুলিসেকে ঘুষ দিয়ে আমি এসেছি সেই তাদের কোলে তুলে নিতে, তাদের বমন অবধি নিজের হাতে পরিষ্কার করতে যে পারে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার স্পর্দ্ধা আর আমি রাখিনে, ভূপতিবাবু!

পুলিষকে ঘুষ দিলেন কেন ?

তারা লাঠির গুঁতোয় এদের সরিয়ে পথ করে নিয়ে এল আমায়! দিল্লী যেতে হ'বে কি-না। না ভূপতি বাবু, আর না, অনেক হ'য়েছে। বলিয়া সে কোটটা খুলিয়া হরে'র হাতে ফেলিয়া দিয়া ভূপতির পাশে বসিয়া পড়িয়া কাজের অন্বেষণ করিতে লাগিল।

ভূপতি হাসিয়া কহিলেন—সুরেন বাবু, ঐ জেমস-টার মত সাহেব-

গুলোর ব্যবহার দেখলে, বাস্তবিক বলছি আমি আপনাকে ভারতবর্ষে একটা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হ'য়েছে বলে আমার মনে হয়। কি স্পর্দ্ধা দেখুন ত! এক ত রেলের প্ল্যাটফর্ম, ওয়েটিং রুম হ'য়েছেই যাত্রীদিগের জন্য, তার ওপর এই সব আশ্রয়-শূন্য বেচারারা সেই আসাম থেকে তাড়া খেতে খেতে এসে হাজির হ'য়েছে—তা'তেও ওঁদের আপত্তি রাগ। শুধু তাই নয়। যারা সমর্থ, সক্ষম—তারা ত রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে পুলিসের লাঠি জুতো খাচ্ছে—সে কি হ'বে উপায় নেই কিন্তু যারা অসমর্থ, পীড়িত—দুর্ভাগা ভারতবাসী বলেই এই ওয়েটিং হলেও তাদের স্থান হ'বে না; এ কি অন্যায়। আর—এই কুলীর দল ভারতবাসী না হ'য়ে যদি ঐ জাতের ঠগ্ মগ মুদ্দফরাস হ'ত—এতক্ষণ দেখতেন সাতখানা এ্যামবুলেন্স কার, বত্রিশটে ভিস্তি, তিরেনব্বইজন জাতভাই একেবারে হুটোপাটি লাগিয়ে দিত।

ভূপতির মুখে হাসিটি যেন লাগিয়াছিল। প্রশান্ত বদনমণ্ডল স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে পরিপূর্ণ—কিন্তু এই কথাগুলি শেষ করিতে তাঁহার সেই সদাপ্রফুল্ল আননও স্থির গম্ভীর হইয়া গেল। তিনি একটু থামিয়া পুনরায় কহিলেন—আর তা'ও বলি, গোড়ার দোষ ত বাপু আমাদেরই। আমাদের দেশের গরীব গুর্ব্বোদের অবহেলা কর্ব্বার স্পর্দ্ধা ত আমরাই ওদের দিয়েছি। আমরা যদি এই হতভাগ্য গরীবদের উপেক্ষা না করি ওদের সাধ্য কি ওরা করে! আমরা দেখব না, ওরা বিদেশী, বিজাতী ওদের কি দায় পড়ে গেছে বলুন ত!

ভূপতি আবার থামিলেন; মিনিট দুই পরে সহাস্যে কহিলেন—আজ এই ত আমার সামনে গেলেন দেখলুম,—মান্যবর পুকুরপাতীর রাজা সাহেব

গেলেন, মুখুর্য্যে সাহেব গেলেন কৈ, এই যে পাঁচ সাত হাজার দেশবাসী কেঁদে রাস্তার মাটি ভেজাচ্ছে তাঁদের পা ত সে পেছলে পেছলাল না! হোক্ দিকিন্ একবার ঐ সেক্রেটারী বুলক্ না ভাল্লুক সাহেবের 'পিসে-মশায়ের মাস্‌তুতো ভায়ের অসুখ, ঐ রাজা ফাজা সব দু'তিনশ টাকা গাড়ী ভাড়া খরচ করে—দেশ (রাজত্ব!) থেকে আস্‌বেন-এখন ছুটে,—আহা, আহা! বাছারে! অসুখ করেছে! আহা, উহু, আহা মরি—আরও কত কি!

তাঁহার বলিবার ভঙ্গীটি এতই হাস্যোদ্দীপক, সুরেন না হাসিয়া পারিল না। ভূপতির সহচরগণও হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভূপতি বলিলেন—না না, সুরেন বাবু, নাঃ তোমাকে সুরেন বাবু আর বল্‌তে পারি নে—আমার ছেলের বয়সী তুমি! তোমাকে আবার বাবু! হ্যাঁঃ!

সুরেন বলিল—আপনি আমাকে সুরেনই বল্‌বেন।

বলবই ত!—বলিয়া ভূপতি হাসিলেন।—কৈ হে, ওদিকটায় ঠিক হ'চ্ছে ত?—তিনি উঠিয়া একবার সমস্ত স্থানটি পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সুরেনের পাশে বসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ যা বল্‌ছিলুম! রাজা সাহেব এলেন, হাসলেন। আপ্যায়িত করতে বল্‌লেন এই যে ভূপতি বাবু, আস্‌চেন না? আমি বল্লুম আজ্ঞে হ্যাঁ যাচ্চি বৈ কি! আপনি একটু এগিয়ে যান্! আমি এদের নিয়ে একটু ব্যস্ত আছি।—শুনে রাজা ত হেসে একেবারে খাজা!—আমার একটি আড়াই বছরের নাতি আছে, তাকে যদি কেউ বল্লে 'রাজা' সে অমনি উত্তর দিলে—রাজা, সে খায় খাজা।—অর্থাৎ রাজা রাজড়া লোক, কি খাবে

বল ! রসগোল্লা, পান্তুয়া, সব ছোট, ছোট জিনিষ, তাই সে এ-তো—বড় একটা জিনিষ তাদের কেবল মাত্র খাদ্য করে দিয়েছে।—তা, আমাদের এই রাজাটিও আমার কথা শুনে এমনি ভুঁড়ি ফুলিয়ে হাসলেন যে তাঁর মুখখানা ঠিক একখানা খাজা খাবার মতই ফাঁক হ'য়ে গেল।—স্বর একটু নামাইয়া বলিলেন—এই রাজকুল প্রদীপটিই না খবরের কাগজে ক্রমাগত বিজ্ঞাপন দেন—বিলাতী গবর্ণেশ খুজ্‌তে !

সুরেন বলিল—প্রায়ই দেখি বটে ! আচ্ছা ভূপতি বাবু, রোজই কি ওঁর নতুন নতুন লোকের দরকার হয় ?

কে জানে বাপু—কি করে ? আমার মনে হয় ভদ্র মেয়ে কেউ থাকতে চায় না, পালিয়ে যায়, তাই। সে মরুক্ গে যাক্—দুহাজারটা রাখুক ছাড়াক আমাদের দরকার নেই। আমাদের হিমাচল, প্রভাস এরা সব না-কি রাজার কাছে দরবার করেছিল ঐ গোয়ালন্দের কাছে ওঁর দু'তিনশ' বিঘে জমি পড়ে আছে সেইখানেই এদের একটু স্থান দিতে ! তা ইংরেজের বিপক্ষতা করা হ'বে বলে রাজা তার করে মানা করে পাঠিয়েছিলেন।

সত্যি ভূপতি বাবু, এ বেচারাদের উপায় কি হ'বে ?—বলিয়া সুরেন উত্তরের আশায় হাঁ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ অবধি ভূপতি কোন কথাই কহিলেন না। মিনিট পাঁচেক পরে বলিলেন—এদের যে দেশ, সে ত আর সোনার বাংলা নয়। তাহ'লে এমন পালে পালে দলে দলে দেশ ছেড়ে, এত কষ্ট সয়ে আসামেই বা মরে থাকবে কেন ? এরা যে দেশে গিয়ে কি করবে—তা ত ভেবেই ঠিক করতে পারছি নে ; অবশ্য আপাততঃ দেশে পাঠানো ছাড়া অন্য উপায় ত দেখিনে। এবং তাই

আমাদের কর্ত্তে হ'বে। আর কালে সে-দেশও যা'তে সোনার বাংলা না হৌক্, রূপোরও হয় সে চেষ্টাও করা যাবে। কি বল, হ'বে না! গভর্ণমেন্ট সাহায্য করুক—আমি ভার নিচ্ছি, ওদের মেঠো প্যাহাড়ে দেশকে আমি বাংলার মত না পারি, বাংলার নীচেই দাঁড় করিয়ে দেব। টাকার দরকার, বুঝলে না হে, টাকা দিক্ ওরা না করতে পারি তখন তার কথা।

সুরেন জিজ্ঞাসিল- আপনি কি মনে করেন গভর্ণমেন্ট টাকা দেবে?

ভূপতি হাসিয়া বলিলেন—ঠিক বলা যাচ্ছে না, দেবে কি-না; উচিৎ দেওয়া, তবে স্বজাতীর ব্যবসায় ক্ষতি হ'বে, চা-বাগানে কুলী না পেলে চায়ের কাজই বন্ধ হয়ে যাবে—এই আক্রোশেই যদি না দেয়।

সুরেন বলিল—আমারও তাই মনে হয়।

কিন্তু তাহ'লে ত চল্‌ছে না—দিতেই হবে। তবে এক আশা, বুঝলে সুরেন, এখন আর কোন আবেদন অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা ওদেরও নেই। দেশময় ধর্ম্মঘটের বন্যা ব'য়ে এইটাই যা মঙ্গল হ'য়েচে। না, না—ধর্ম্মঘটের পক্ষপাতী আমি নই, তবে তাতে করে যে মঙ্গলটা হ'য়েচে—সেটা ত চোখেই দেখ্‌তে পাচ্ছি কি-না, তাই বল্‌ছি। এই ধর না—ট্রাম কোম্পানীর ধর্ম্মঘটে লোকের ত কত অসুবিধাই না হ'য়েচে—তবুও সেই গরীবদের যে উপকার হয়েচে এবং হ'চ্ছে সে তুলনায় লোকের অসুবিধাটা আমি ধর্ত্তব্যই মনে করি না।

সুরেন নীরবে বসিয়া রহিল।

ভূপতি বলিলেন—দেখ, মনিবকে চোখ রাঙানোটা ভালো নয় আমি স্বীকার করি, কিন্তু যারা কেবল চোখ রাঙিয়েই কাজ আদায় করতে চায়,

সময়মত তাদেরও, হ'লেই বা মনিব—তাদেরও চোখ্ রাঙাতে দোষ নেই ; ভেবে দেখ দেখি, গতর খাটিয়ে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে' চাকরী করতে গিয়েও বেচারারা কি লাঞ্ছনটাই না ভোগ করত! আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিই, সুরেন, যাঁরা এই সমস্ত অন্যায়ের প্রতীকার করতে বদ্ধপরিকর হয়ে কাজ করছেন। গলাবাজী করে, লাট বেলাটের সভার সভ্য হয়ে দেশের কাজ তারাই করে না, সুরেন। করে তারা, দেশের এই দীন দরিদ্রের দুঃখে, পীড়নে যাদের হৃদয় বিচলিত হয়; এই সমস্ত হতভাগাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের দুঃখ মোচন করতে যাদের আত্ম-মর্য্যাদায়, অভিমানে আঘাত না লাগে - কাজ তারাই করে! আমি এমন লোক অনেক দেখেছি সুরেন, যাদের নাম কেউ কখনও শুনে নি, কাগজে কখনও ছাপা হয় নি, কোন সভায় বক্তৃতা করতে কখনো দাঁড়ায় নি, এমন সঙ্গোপনে, এমন প্রাণপণ চেষ্টায় কাজ করে তারা—যাদের তুলনায় তুমি-আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। তারা যে কাজ করে, সে দেশের তরে, দেশবাসীর তরেই করে থাকে। বাহবা নেবার জন্যে করে না।

ভূপতি নীরব হইলেন। সুরেন তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাঁহার মুখের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা-সম্মান-শ্রীমণ্ডিত অপূর্ব্ব জ্যোতিঃতে সুরেনের চিত্তও ভরিয়া উঠিল। হঠাৎ যেন দিগ্বিদিকের আঁধার টুটিয়া আকাশের আলো আসিয়া তাহাদেরই মুখের'পরে পড়িল, লোকের চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়াই যাহারা জীবনের সাধনা পূর্ণ করিয়া চলিয়াছে।

সেই রাত্রে দুখানা স্পেশ্যাল ট্রেণে কুলীদের পাঠাইয়া দিয়া ভূপতি যখন সুরেনের হাত ধরিয়া বলিলেন—সুরেন, কাউন্সিলে আমার পথ

ছেড়ে দিয়েছ বলে নয়, সত্যি তোমাকে বন্ধুরূপে পেয়ে আমি যে কত সুখী হ'য়েছি তা ত আমি মুখে বল্‌তে পারব না—তখন সুরেন তদগদচিত্তে ভূপতির হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আজ বুঝতে পারছি ভূপতিবাবু, দেশের কাজ করব বলে গলাবাজী করলেই কাজ করা হয় না। দেশের কাজ করতে যে হৃদয়ের দরকার সব চেয়ে বেশী—এ ধারণা হয়ত অনেকের নেই, আমারও ছিল না। এবং যে মুহূর্ত্তে জ্ঞান হ'য়েছে আমার সে স্পৃহাও আর নেই। দেশের গরীবই যে দেশের স্বরূপ মূর্ত্তি, আমরা যখন তা'দেরই ঠেল্‌তে মারতে পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করতে পারি, তা'দের জন্য হৃদয় কোণে এতটুকু স্থান দিতে পারি না—তখন দেশের কাজ করতে যাবার কল্পনা করাও মহাপাপ। ভূপতিবাবু, আমার সে স্পর্দ্ধা ঘুচেছে আপনাকে দেখে! এবং আত্মগর্ব্বে যে স্থানটা পরিপূর্ণ হ'য়েছিল, তা যেমন শূন্য হ'য়ে গেছে—তেমনি আবার ভরে উঠেছে আপনার মহত্ত্বে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধাতে!

ভূপতি তাহার হাত ধরিয়া সাদরে কহিলেন—তুমি বড্ড ছেলেমানুষ রায়! কেবল যা তা বাজে বক।

সুরেন বলিল—বাজে বকি!

ভূপতি বাধা দিয়া বলিলেন—চল বাড়ী যাবে ত!

—১৮—

আলোক যখন চক্ষু চাহিল, ঘরে কেহ নাই, চারিদিকে বারবার দৃষ্টি করিয়াও কুমুদের প্রেতাত্মার সন্ধান পাইল না। সভয়ে ভারী মস্তিষ্ক লইয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই হৌক অথবা নিস্পৃহ অলসের মত পড়িয়া থাকিবার ইচ্ছাতেই হৌক্—দু'একবার উঠিয়া দাঁড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া আলোক চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল।

প্রতি মুহূর্ত্তেই আলোক আশা করিতেছিল, খোকাকে দুধ খাওয়াইয়া স্নেহময়ী এখনই ফিরিয়া আসিবেন্। কিন্তু দেখিতে দেখিতে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, ওবাড়ীটা হইতে একটু সাড়া শব্দও আসিল না। নিশীথের নিস্তব্ধতা আশে পাশের অন্য বাড়ী গুলাকেও যেমন নিদ্রাঘোরে অচেতন করিয়া রাখিয়াছিল, এই বাড়ীটাও তাহার ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হইল না। অথচ ঐ বাড়ীটার স্নিগ্ধোজ্জ্বল দৃষ্টিই যেন এই ভাঙ্গা বাড়ীর উপরে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত পড়িয়া বাড়ীটাকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছিল। তাই সে কায়মনে আশা করিতেছিল, স্নেহ না আসিয়া পারিবে না।

তার সারা হৃদয় জুড়িয়া স্নেহময়ীর পবিত্র মধুর ব্যবহারটি নির্জ্জনে যেন মধুর রাগিনী রচনা করিতেছিল। যতই ভাবে ততই মধুর হইয়া

আগাগোড়া সবটা বার বার তাহার মনের রন্ধ্রগুলি ভরিয়া যায়। নারী! সে'ও ত নারী, কিন্তু এত মাধুর্য্য সে কোন্ কুবেরের ভাণ্ডার হইতে অযাচিত রূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছে, যাহার কণামাত্র উপভোগ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া আলোকের হৃদয়মন যেন অমৃত সমুদ্রে স্নান করিয়া উঠিয়াছে—এমনি আনন্দে সুখে শান্তিতে ভরিয়া গেছে—বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

হঠাৎ চোখ্ চাহিতেই দেখিল, শত সূর্য্যের কিরণে অন্ধকার কক্ষ যেন সহসা আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে; কোন্ রাজ্যের পারিজাতের সৌরভে আকাশ ভুবন আমোদিত হইয়া গেছে, সে যে কি—এত আলো কিসের, এত গন্ধ কোথা হইতে আসিল, ভালো করিয়া দেখিয়া লইবে, স্নেহময়ীর কোমলকণ্ঠে তাহার জড়িমা কাটিয়া গেল। কিন্তু সেই সামান্য স্নেহের সম্ভাষণেই তাহার চোখের পাতা অকস্মাৎ জলে ভরিয়া গেল। স্নেহময়ী ডাকিলেন—শুয়ে আছ বোন্!

আলোক বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিল—এত দেরী করতে হয় দিদি!

খোকা কিছুতেই ঘুমোচ্ছিল না ভাই। না ঘুমোলে ফেলেও আস্‌তে পারি নে, তাহ'লে বাড়ীশুদ্ধ লোকের ঘুমের দফা শেষ হয়ে যেত। যতক্ষণ জেগে থাকবে আমার কাছ ছাড়া হ'বে না। এই সে ঘুমোল, আমিও আস্‌ছি।

আলোক নীরবে বসিয়া রহিল। যতক্ষণ স্নেহ আসে নাই, আলোক কত কি ভাবিতেছিল, কত কথা বলিবে, কত কথা শুনিবে, কিন্তু তাহাকে সম্মুখে পাইয়া তাহার প্রগল্‌ভ রসনা কেন যে নড়িল না, সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইতেছে না,—শুনিল—

আজ সেই দিনের কথা মনে পড়ছে আলোক। যেদিন প্রথম দুপুরবেলা তুমি ঐ ভাঙ্গা দরজাটা পার হ'য়ে এ বাড়ীতে প্রথম পদার্পণ করলে। রাধা আর আমি ঐ জানালাটা দিয়ে দেখেছিলুম।

আলোক শুনিতে লাগিল। স্নেহ বলিলেন—বললে তুমি বিশ্বাস করবে কি-না জানি না, কিন্তু তোমার মুখে কি ছিল কে-জানে, তোমার চোখে কি ছিল তাই বা কে-জানে—কিন্তু দেখেই আমার মনে হইয়াছিল, অজয় বাবু সেরে উঠবেন। আলো বর্ষাকালে ধানের ক্ষেতের মত, সমুদ্রবক্ষে শারদ জ্যোৎস্নার মত, মেঘের কোলে রৌদ্রের মত—তোমার সে কি সুন্দর পবিত্র মূর্ত্তি আমাদের নয়ন মনে প্রকাশ পেয়েছিল······

আলোক বাধা দিতে পারিল না. শুনিতে হইল—যা কেবল মাত্র আমি মনের মধ্যেই অনুভব করতে পারি! কে তোমার সার্থক নাম রেখেছিল, আলোক। দিবসের প্রকাশে অন্ধকার যেমন আত্মহত্যা করে' মরে যায়—তোমার আগমনে এবাড়ীর বহুকালের বহু অমানিশার অন্ধকার তেমনি করে মরে গেছল। এতে তোমার লজ্জা করবার কি আছে, বোন্. আমি ত তোমার রূপের প্রশংসা করছি নে। তোমার যে রূপের জ্যোতিঃতে আমার হৃদয় ভরে আছে, বাহিরের রূপ ছার তার কাছে। তোমার সেই রূপই আমি দেখেছিলুম, আলোক। যে-রূপ সংস্কার করতে কোন তৈল সাবান মুকুরের আবশ্যক করে না, যে-রূপ ধন্য করতে জগতের কারুই কোন অপেক্ষা রাখে না, আমি তোমার সেই অপার্থিব হৃদয় রূপই দেখেছি।

সত্য কথা বলিতে কি আলোক লজ্জা পায় নাই। তবে পরম গুরুজনও যখন আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করেন তখন যেমন আপনা হইতেই

মাথা নত হইয়া যায়, আলোকের মুখটিও তেমনি নত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু স্নেহময়ী সে'টিকেই লজ্জা কল্পনা করিয়া কহিলেন—তুমি আসতে যেন কুমু আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছিল। অজয়বাবু যে'দিন অন্ন পথ্য করলেন সেই দিনই দুপুর বেলা তুমি গেলে-না, সে'দিন বেচারি এই দোর গোড়ায় ভাতের থালা হাতে কত রাত্রি অবধি যে কেঁদেছে তা আর কি বল্‌ব! আমি ঐ জানালায়—সে এখানে। তোমার কথা বলে আর তার আশ মিটছিল না।

হঠাৎ স্নেহময়ীকে থামিতে দেখিয়া আলোক মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসিল —তার পর?

তার পর! ঠিক বুঝতে পারিনি কেন, দিনকত একেবারে চুপ-চাপ হ'য়ে গেল। দেখছই ত! এবাড়ী-ওবাড়ী দু'বাড়ীর কোন কথাই কারু অজ্ঞাত থাকে না,—দিনকত তোমার নামই শুন্‌তে পেলুম না। আমরা জিজ্ঞাসা করতুম, কুমুদ ভালো করে' তার জবাবই দিত না। সেই সময় রাধা একটা কথা আমাকে বলেছিল……

বৌদি কি বলেছিলেন?

রাধা বলেছিল, আলোক বোধ হয় ওঁদের কি রকম বড়লোক আত্মীয়, দয়া করে' এসেছিলেন একবার—ফিরে গিয়ে আর খোঁজ খবর নেন্ না এঁরাও তাই চুপ চাপ।

আলোক জিজ্ঞাসিল—আপনিও তাই বিশ্বাস করলেন?

করলুম বৈ-কি!—স্নেহ একটুখানি হাসিলেন। তাহার পর আবার বলিলেন—সে কথা বিশ্বাস করেছিলুম, আলোক, কিন্তু এ বিশ্বাস আমি কোন দিনই করি নি যে গরীব আত্মীয় বলে, চোখের আড়াল হ'তেই

তুমি এদের ভুলে গেছ। যে তোমাকে দেখেছে—সে কি তোমাকে এমন ভুল বুঝ্‌তে পারে! তোমার মুখে যে অনন্ত আশা, অফুরন্ত স্নেহ-ভালবাসার সুস্পষ্ট রেখা—আমি নিজের চোখে দেখেছিলুম। কাজেই কুমুদের অসুখের সময় যখন কুমুদ কোন মতেই তোমাকে খবর দিতে দিলেন না তখন আমিই আমার ছোট ভাইটিকে পাঠাচ্ছিলুম তোমার কাছে। সে-ই ত প্রথমবারে তোমাকে খবর দিয়ে এসেছিল—তোমাদের বাড়ী সে চিন্‌ত।

তা জানি! কিন্তু কৈ—খবর ত আমি পাই নি।

না। অনিল যাচ্ছে জান্‌তে পেরে অজয়বাবু তা'কে এমনি তাড়া দেন যে সে বেচারা কাঁদ কাঁদ হয়ে আমার কাছে এসে বলেছিল, দিদি লোকটার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া স্নেহ নীরব হইলেন। অনেকক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না। প্রায় দশমিনিট পরে আলোক আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসিল—দিদি, অজয়বাবু না দিদি কে আমাকে খবর দিতে দেন নি—বলুন ত?

স্নেহ বলিলেন—তা ঠিক বল্‌তে পারলুম না ভাই। কুমুদ অসুখের প্রথম ক'টা দিন আমার কাছেই বলেছে, না, না, রোজ রোজ অসুখ অসুখ করে তা'কে আমি বিরক্ত করতে পারব না। সে ছেলে মানুষ, তার কি এই দুঃখকষ্ট সহ্য করবার সময়! আবার শেষকালে দেখ্‌লুম অজয়বাবুও আমার ভাইটিকে তাড়া করে ভাগিয়ে দিলেন। কিছু বুঝ্‌তে পারলুম না ভাই। কি যে রহস্য ছিল এর মধ্যে কেবল মাত্র তারা দু'জনেই তা জান্‌ত।

আলোক বলিল—রহস্য কিছুই নয় দিদি। কবে আমার বে'র সময় না-কি অজয়বাবু আমাদের ওখানে গেছলেন, কেউ খাতির যত্ন করে নি, তাই ওঁর অভিমান। কিন্তু এটা উনি দেখলেন না ভেবে, খাতির যত্ন করবে কে? আমার মা নাই, বাপ নাই, একটি ভাই-ও নাই—কেই-বা ওঁকে চিন্‌বে, কে-ই বা খাতির করবে! নৈলে তুমি-ই বল দিদি, নেমন্তন্ন করা হ'য়েছিল কি আর তাঁকে অপমান করবার জন্যেই?

স্নেহময়ী অল্প হাসিয়া বলিলেন—যদি রাগ না কর ত বলি ভাই। বড়লোকের নেমন্তন্ন আর নিমন্ত্রিতের তারতম্যটা বড় কম নয়—এ আমি নিজেই একটা বড় বাড়ীতে—তাঁদের আবার রাজা খেতাব আছে—দেখেছি। জুড়ী গাড়ী থেকে যিনি নামলেন, নেমন্তন্ন রাখতে, বাড়ীর কর্ত্তা তাঁকে দোতলায় পাঠিয়ে দিলেন; যিনি মোটর থেকে নামলেন, তিনি তেতলায় স্থান পেলেন—এরোপ্লেন তখনও আমদানি হয় নাই—নৈলে তার আরোহীদের স্থান হ'ত—চার্‌তলে! আর যে বেচারা মোড়ের মাথায় ট্রাম থেকে নেমে চাদরে মুখ মুছতে মুছতে ফটক পার হ'লেন, নিধু চাকর তামাক সাজছিল, তার পাশের বেঞ্চিটায় বসে, থেলো হুকোয় তামাক খেয়ে, একতালার স্যাঁতসেতে ঘরে এক পাত লুচি আলুদ্দমে জাহাজের খোলটা বোঝাই করে' আবার ট্রাম ধরতে ছুটলেন। 'যথা-বিহিত সম্মান পুরঃসর' কথাটা ছাপার কাগজে রয়ে গেল এবং নিবেদকের সাক্ষাৎকার লাভের সৌভাগ্য তাদের অদৃষ্টে আর ঘটল না।—আচ্ছা তুমিই বল আলোক এ রকম কি হয় না?

আলোক বলিল—হয়, নিশ্চয়। নৈলে আপনি বল্‌বেন কেন!

স্নেহময়ী পুনরায় কহিলেন—এবার আর একটা মজার কাণ্ড

হ'য়েছে। একেবারে অপূর্ব্ব, নূতন। একজন দেখে এসেছে, সেই বল্লে। নেমন্তন্ন বাড়ীতে ঢুকে যেখানে বর বসেছে সে সেইখানেই বসে আছে, বসেই আছে। মাঝে মাঝে লোকজন আস্‌চে, উঠে যাচ্ছে – এমনি ভাবে ঘণ্টা দুই কেটে গেলে, সে ভাবলে এ ত বড় আশ্চর্য্যি, কেউ ডাকেও না, এ ত ভারী বিপদ। সে আবার বাড়ীতে খাবে না বলে এসেছে; দোকানের খাবার খেলে অম্বল, অসুখ—মহামুস্কিল, উপোস্ করেও ত থাক্‌তে পারে না।—ক্রমাগত এদিক্ ওদিক্ করছে। কতবার কর্ম্ম-কর্ত্তাদের সামনে পড়ল, অনেকে তাকে চেনে, কিন্তু খাবার কথাটা কেউ কিছুই বল্লে না। শেষকালে সে ভাবলে, হয়ত বিলীতি প্রথায় আজকালকার নিমন্ত্রণ রক্ষা এই রকমই হ'য়েছে—এই ভেবে সে ঢেঁকুর (!) তুল্‌তে তুল্‌তে বেরিয়ে আস্‌বে হঠাৎ চোখ্ পড়ল তার বড় আটচালার দিকে। অনেক লোক সেখানটায় জটলা করছিল। কাছে গিয়ে দেখ্‌লে, লেবেল আঁটা—তাড়াতাড়ি। আর একটু সরে গিয়ে দেখ্‌লে লেখা—ট্রামের জন্য; আর এক জায়গায়—নিরামিষ; আর একটা টিকিট মারা রয়েছে—ব্রাহ্মণ; আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌লে – কাঁটা চাম্‌চে। শুন্‌তে পেলে, একটি ছোকরা আর একটিকে বল্‌ছে—আমি ভাই তাড়াতাড়িতে রইলুম। অপর জন বল্লে—আমি ট্রামে আছি।—তখন আসল ব্যাপারটা সব দিনের আলোর মত সাফ্ হ'য়ে গেল। সে'ও তখন একবার্ করে' সব ডিপার্টমেন্টে ঢুকে চেকে-চুকে বাড়ী চলে এল।—বেশ বন্দোবস্ত নয় ভাই! কাউকে কিছু বল্‌তে হ'চ্ছে না, যার ফেরবার তাড়া আছে সে তাড়াতাড়ি ডিপার্টমেণ্টে ঢুক্‌ছে, যে ট্রামে যাবে, তার চেয়েও সুইফ্‌ট—ট্রাম বিভাগে ঢুক্‌ছে—বেশ, না?

আলোক ভালো-মন্দ হাঁ, না কিছুই বলিল না। স্নেহময়ী বলিলেন—কোথায় গেল আমাদের সে দিন! যেদিন নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত ইতর ভদ্রের পায়ের ধুলো পড়লে বাড়ী পবিত্র হ'য়েচে বলে আমাদের বাপ-ঠাকুরদা আহ্লাদে তদ্গতচিত্ত হ'তেন! কোথায় বসান, কি কথায় তাঁদের আপ্যায়িত করবেন, আদর অভ্যর্থনার এতটুকুও ত্রুটি হ'লে মৃত্যু কামনা করতেন, কোথায় গেল সে সব দিন। সে গিয়ে এল কি-না টিকিট-আঁটা হোটেল-খানার বন্দোবস্ত। শুনছি হোটেলেও এই রকম টিকিট মারা থাকে, দেখবার ভাগ্যিত হয় নি, তুমি কখন দেখেছ, আলোক?

সে-কথার উত্তর না দিয়াই আলোক আরক্তমুখে কহিল—একটা আধটা বাড়ীর সংবাদ শুনেই আপনার ধারণা জন্মে গেল সারা বাঙ্গালা দেশটাতেই ঐ হোটেলখানার ব্যবস্থা হ'য়েচে?

একমিনিট থামিয়া, যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া, সে আবার বলিল—অন্ততঃ যেদিনের কথা অজয়বাবু বলেছেন সেদিন ঐ একতলার চারতলার ব্যবস্থাও ছিল না, তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ির টিকিট এঁটে বাড়ীর কর্ত্তারা নীচের মজলিসে বসে বাঈনাচও দেখ্ছিলেন না।

স্নেহময়ী গল্পচ্ছলে উক্ত ঘটনা দুইটি বিবৃত করিয়াছিলেন। আলোক যে তাহাতেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবে এ তিনি জানিতেন না। কেমন করিয়াই বা জানিবেন! এ গল্প বলায় তাঁহার ত কোনই অভিসন্ধি ছিল না।

কিছুক্ষণ স্নেহময়ী কোন কথাই বলিলেন না। নির্দ্দোষী যে সে কোনমতেই হঠাৎ হাতজোড় করিয়া বিনা দোষের মাপ চাহিতে পারে না—স্নেহ আলোককে রাগ করিতে দেখিয়াও হঠাৎ কিছুই বলিতে

পারিলেন না। আলোক সেই যে মুখ ঘুরাইয়া বসিল, স্নেহ তার মুখের কোন অংশটাই দেখিতে পাইলেন না ;—কেবলমাত্র তাহার পাতলা-কাপড়-ঢাকা কবরীর হীরা মুক্তাগুলি প্রায়ান্ধকার কক্ষে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছিল—স্নেহ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—কোন্ কথায় যে এত রেগে উঠ্‌লে তা ত বুঝতে পারলুম না। কোথায় কোন্ দেশে কবে কি হ'য়েছে, তাই গল্প করেছি—আমার বরাতদোষে সেইটিই উপলক্ষ্য করে তুমি আমার উপর রাগ করলে আলোক······

আলোক মুখ না ফিরাইয়াই বলিল—আপনার ওপর রাগি নি। সত্য এমন একটা বিশ্রী ধারণা অজয়বাবুর ছিল আমাদের প্রতি। সে আমি প্রথম যেদিন আসি, সেইদিনই টের পাই এবং পরে যে ক'দিন ছিলুম আমার হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর এ বিরুদ্ধ ধারণার সংঘাত বড় অল্প লাগে নি। আমি না-কি এসেছিলুম, মার পেটের বোনের বিপদকালে, তাই অম্লান বদনে সে সমস্ত সহ্য করেই যেতে পেরেছিলুম।

তাই হ'বে আলোক। কুমুদের অসুখের সময় একদিনের কথা আমার মনে আছে—তখন খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা, অজয়বাবু নিজেই তোমাকে খবর দিতে যাচ্ছিলেন, কুমুদ যেতে দেয় নি। সে বলেছিল "আলো কি আমার মাইনে করা নার্স যে যখন ডাকবে 'তু' করে আস্‌বে, যেতে বল্লেই চলে যাবে? কখনও তুমি তাকে ডাক্‌তে পাবে না" সে আরও বলেছিল "তোমার অসুখে আমি তা'কে ডেকেছিলুম, আমার বিপদের না-কি তখন সীমা ছিল না, তাই ক'দিন এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তা'কে থাক্‌তে দিতে পেরেছিলুম। আর না।"—এ আমি নিজের

কানেই শুনেছিলুম, কিন্তু কিছু বুঝতে পারিনি। তুমি কিছু বুঝলে ভাই ?

বুঝেছি—বলিয়া আলোক অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া—বিগত দিনের সেই কথাগুলি আর একবার মনে করিয়া লইতে লাগিল।

অজয়ের অসুখের সময় সে যখন প্রাণপাত সেবা করিয়াছিল, একটি দিনের তরেও আলোক অজয়ের মুখের একটি কথা শুনিতে পায় নাই! এবং কুমুদ যে ইহাতে আদৌ সুখী হয় নাই আলোক তখনই তাহা জানিতে পারিয়াছিল। কিসে প্রাণাধিকা ছোট বোন্‌টির মুখে হাসি দেখিবে, তাহার মিষ্ট কথা শুনিবে কুমুদের সেই চেষ্টার অন্ত ছিল না। সেই প্রথম দিনের অজয়বাবুর রোষক্ষুব্ধ স্বর আজও তাহার কানে বাজিতেছে, বারবার কথার উত্তর না দিয়া তাঁহার মুখ ফিরাইয়া লওয়া আলোক ভুলে নাই। আজ সে বুঝিতে পারিল—কুমুদ অজয়ের অজ্ঞাতেই আলোককে ডাকিয়াছিল; এবং তাহার জন্য যে অজয় কুমুদকে দুঃখ দিতে ছাড়ে নাই—স্পষ্ট বুঝিয়াই তাহার নারী চিত্ত সেই পুরুষের বিরুদ্ধে একেবারে সাড়া দিয়া উঠিল।

জিনিষটা আরো পরিষ্কার হইয়া গেল, খামে মোড়া একখানা চিঠিতে। স্নেহ বিছানার তল হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া আলোকের হাতে দিয়া বলিলেন—দেখ ত বোন্ এটা কি ?

আলোক খামখানা খুলিয়া পাইল, সে একশত টাকার নোটখানি আর কুমুদের লেখা একখানা চিঠি। আলোটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া পড়িল :—

* * * * *

না আলো, তোর টাকাটা কোনমতেই আমি খরচ করতে দিতে পারব না। তোর দান নেবার অধিকার নেই বলে নয় বোন্—সে অধিকার যে নিজেই তোর কাছে চেয়ে নিয়েছি—তা'তে ত আমার লজ্জা নেই কিন্তু এ ত আমার কিছুতেই সহ্য হ'বে না বোন্ যে এই অমূল্য স্নেহের দানকেই লোকে ভিক্ষা বলে নাসিকা কুঞ্চিত করবে। দুঃখ এ নয় বোন্ যে তোর দান আমি নিতে পারলুম না, দুঃখ এই যে তো'কেও লোকে ভুল বোঝে।

এ সত্য আমি কিছুতেই গোপন করতে পারছিনে আলোক যে আমি তো'কে ডেকে এনে যে অপমান করেছি তার জন্যে একমাত্র আমিই দায়ী। তবে সেদিন আমার চারিদিকে যে ঘনীভূত মেঘ বজ্রধ্বনিতে গর্জ্জে উঠেছিল—আমার সেই মহাদুঃসময় স্মরণ করে তুই আমার সর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করিস্। সে আমি যা করেছিলুম সেই আমার ধর্ম্ম। আর কোন কারণেই আমি তো'কে এ-হেন অপমান সইতে দিতে পারব না। আমার নিজের প্রাণের জন্যেও নয়।

* * * * *

চিঠি পড়া শেষ করিয়া আলোক মূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। হাঁ—কুমুদ-ই তাহাকে ডাকিতে দেয় নাই। কুমুদ জানিত, ডাকিলেই সে আসিবে, তবু ডাকে নাই। কেন ডাকে নাই তাহার কারণটিও আজ সে জানিতে পারিয়াছে। 'সে আমি যা করেছিলুম সেই আমার ধর্ম্ম,—' আলোক নিজের মনেই স্বীকার করিল, সেই তার ধর্ম্ম! ঠিক্—

ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন সেই পুরুষের বিপক্ষে একেবারে তীব্রবেগে ধাবিত হইল, একদিন যাহাকে সে কুমুদের সর্ব্বস্ব বলিয়া

জানিত। তাহার মনে হইল—কি সঙ্কুচিত, সঙ্কীর্ণ এই পুরুষের মন। ইহারাই আবার নারীর ছল ধরিয়া জগৎময় তাহাদের অখ্যাতি জাহির করিয়া বেড়ায়। হারে অধম! এতটুকু উদারতা যে তোদের নাই, তোরাই চাস্ বিজয়ীর মত নারীর হৃদয় মনের অধীশ্বর হইয়া থাকিতে! যাহারা আপনাকেই জয় করিতে পারে নাই তাহারাই পরকে জয় করিবার দুরাশায় আকুলি বিকুলি করিয়া মরে!

আলোকের মনে হইল, এই পৃথিবীতে স্বার্থপর বলিয়া যাহারা রমণীর অখ্যাতি রটায়, তাহাদের ডাকিয়া আনিয়া কুমুদের জীবনেতিহাসটি সম্মুখে খুলিয়া দেয়। বলুক তাহারা স্বার্থপর, বলুক তাহারা নীচ নারীর মন!

যেখানে যত পুরুষ—সব একজাতেরই, ইতর বিশেষ নাই, এই ভাবিয়া আলোক সসব্যস্তে দাঁড়াইয়া বলিল—কত বেজেছে দিদি?

বোধ হয় তিনটে হ'বে।

আপনি বাড়ী যাবেন না?

তোমাকে একেলা ফেলে?

তা হোক্ আপনি যান্, দিদি। আমার চাকর, শোফেয়ার সব বাইরে আছে—ভয়ই বা কি! না দিদি, আপনি যান্, আর আমিও যাব এখুনি।

স্নেহ এই ব্যগ্রতার কোনই কারণ না বুঝিয়া বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসিলেন—বাড়ী যাবে?

হ্যাঁ বলিয়া সে নিজে উঠিল। উঠিয়া মধুকে ডাকিয়া বলিল—দিদি বাড়ী যাচ্ছেন—সঙ্গে যা।

স্নেহ প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিল—তাহ'লে কোন উপায়……

নেই। আর তা নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছেও আমার নেই।

স্নেহ আর কি বলিবেন। ব্যথাক্ষুব্ধ মুখে ঘর ছাড়িয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

স্নেহ চলিয়া যাইতেই সেই ঘর ভাঙ্গাচোরা সেই সব আসবাব পুনরায় সজীব হইয়া আলোকের মনের পাতায় ধীরে ধীরে ফুটিতে লাগিল। সব জ্বালা নিবাইয়া, সব বিরুদ্ধতার শেষ করিয়া তাহার নিজের কথাটাই মনে পড়িয়া গেল। নাই বা করিল আত্মীয়তা, নাই বা করিল উপকার, তাই বলিয়া কটু কথা কহিয়া অজয়কে গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিবার সে কে? এ অপরাধের কি তাহার মার্জ্জনা আছে? কুমুদ যেখানেই থাক্—সে কি ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিবে! কখনই নয়! এ অপরাধের সীমা নাই।

নিজের দোষস্খালনের জন্য যত যুক্তি তর্ক আছে ভাবিয়া চিন্তিয়া আলোক প্রশ্নাকারে উত্থাপন করিতে লাগিল এবং নিজেই তাহার উত্তর দিতে লাগিল। কিন্তু একথা ত আর একবার তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না যে উপায় উদ্ভাবন করিবার মত প্রচুর সময় তাহার নাই। বরং যে কথাটি তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে লাফাইয়া উঠিয়া জিভে আটকাইয়া গেল তাহা এই, যে উপায়েই হৌক অজয়কে এই গৃহে ফিরাইয়া আনিতে সে বাধ্য; কুমুদ এই ভারার্পণ করিয়া অন্তরালে বসিয়া আছে। তারপর, তারপর সে এ দেশ ত্যাগ করিবে। সুরেনের পায়ে ধরিয়া বলিবে—কলকাতার বাহিরে যেখানে হোক্ তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া দিক। তারপর যা ঘটিবার ঘটুক। সে দেখিতেও

আসিবে না, কানেও শুনিবে না। তাহাকে ফেরান চাই-ই। কিন্তু কোথায় সে! কোথায় সে! কোথায় পাইবে তাহার সন্ধান। আলোক নারী! ধনবল অর্থবল সব আছে—আবার কিছুই নাই! যাহার ধনে নারীর ঐশ্বর্য্য, যাহার বলে সে বলবতী সে যে আলোকের কার্য্যের অনুমোদন করে নাই, করিবে না! তবে আলোক কি করিবে। কেমন করিয়া তাহার সন্ধান মিলিবে!

ভাবিতে ভাবিতে আলোক ভূতলে শুইয়া পড়িল। কক্ষের মৃদু আলোক অসহ্য হওয়ায় হাত বাড়াইয়া আলো নিভাইয়া দিতেই দেখিল, ঘরের অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই সর্ব্বশক্তিমানের আলোক কক্ষময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

তবুও সে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। চক্ষু চাহিলে পাছে দিবসের আলোকে তাহার সঙ্কল্প হারাইয়া যায় যেন সেই ভয়েই সজোরে চোখের পাতা চাপিয়া পড়িয়া রহিল।

—১৯—

সেই রাত্রে ট্যাক্সি চড়িয়া বাড়ী আসিবার সময় যে কথাগুলি সুরেনের মাথায় তপ্ত কটাহে ব্যঞ্জনের মত ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহা এই যে গরীব ভগবানের বিশেষ মূর্ত্তি, এবং সারা দেশটার চেহারা যে তাহাদের মধ্য দিয়াই জাগিয়া আছে—এ কথাটা আজই সন্ধ্যাকালে সে-ই বলিয়াছিল—যাহাকে সাজা দিবার জন্যই সুরেন সাজ সজ্জা করিয়া পথে বাহির হইয়াছিল। এত বড় সত্য, তীক্ষ্ণ, কঠিন - যে কোনমতেই সুরেন সহ্য করিতে পারে নাই। কিন্তু সে-যে কত খানি সত্য, সে-যে দিনের আলোকের মতই সুস্পষ্ট, সুন্দর, তাহা যখন জানিতে পারিল, সুরেন যেন হাত বাড়াইয়া আলোকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমাকে মাপ কর আলোক!

সেই আলোয় দিগন্ত বিকশিত হইয়া যে-সব সত্য ভাসিয়া উঠিল—তাহার মধ্যে অজয়ের প্রতি আলোকের স্নেহটাও এমন সহজ, মধুর ও রমণীয় হইয়া তাহার মনে দেখা দিল যে সুরেন এবার গিয়া নিজেই আলোককে সঙ্গে লইয়া অজয়ের গৃহে তাহার সেবা সুশ্রূষা করিবে—এই চিন্তায় পুলকিত হইয়া উঠিল।

বাড়ীর দরজায় গাড়ী লাগিতেই দ্বারবান ফটক খুলিয়া দিল। সুরেন

পাগলের মত লাফাইয়া ছুটিয়া একেবারে শয়ন কক্ষে গিয়া হাঁপ ছাড়িল। সুইচ্ টিপিয়া, বাতী জ্বালাইয়া এ-ঘর ও-ঘর করিয়া ফিরিল! কোথায় আলো! কোথায় আলো! আলো! কোথায় তুমি! এ-যে সব অন্ধকার! পাশাপাশি কয়েকটা ঘর ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইয়া সুরেন শয্যা-গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আবার ডাকিল, আলো, আলো! কোথায় আলো!

মনে হইল, আলোক হয়ত বড় রাণীর মহলে আছে। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই। এ মহলে একলা কি-সে ছেলে মানুষ থাকিতে পারে?

সুরেন কল্পনায় আলোকের নিদ্রামগ্ন কাতর ম্লান মুখখানি দেখিতে লাগিল। সে কী সুন্দর! সে মুখ হাসিতে সুন্দর, ক্রন্দনে সুন্দর। সব সময়েই তাহার সৌন্দর্য্য যেন্ দিগন্ত বিস্তৃত বনানীর উপর রৌদ্র কিরণের মত, সমুদ্রবক্ষে চাঁদিনীর মত সুন্দর, সুন্দর!

কখন্ তাহার বিষণ্ণ মুখের ম্লান অধরে চুম্বন করিয়া হাসিতে রঞ্জিত করিয়া দিতে পারিবে—তাহাই ভাবিতে ভাবিতে সুরেন কাপড় চোপড় ছাড়িয়া, শয্যাপ্রান্তে বসিয়া একটির পর একটি সিগারেট পুড়াইতে লাগিল।

এদিকে বড় রাণী যদিও বলিয়াছিলেন—ঠাকুরপো নেই, তাই ভাবছিস্। সে তোকে ভাবতে হ'বে না—আমি বলছি যা—তখন ভাবেন নাই যে সুরেন ফিরিয়া আসিবে! এক ত এবাড়ীর লোক দরিদ্রের আত্মীয়তা গ্রাহ্যই করে না, তাহার উপর সুরেনের অনুপস্থিতিতে আলোক অজয়ের বাড়ী গেছে—জানিতে পারিলে সুরেন অনর্থ ঘটাইবে—ভাবিয়া বড়রাণী শীতের শীতল রাত্রেই ঘামিয়া উঠিলেন। চুপে

চুপে দরওয়ানকে পাঠাইয়া দিয়া মোটরের শব্দের আশায় কান একেবারে খাড়া করিয়া রাখিলেন।

কখন্ চোখের পাতায় একটুখানি আবল্য আসিয়াছিল, যদি সেই অবসরে আলোক আসিয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া থাকে এই মনে করিয়া অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া বড়রাণী সুরেনের কক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুরেন তখন বসিয়াছিল, বড়রাণীর অতি মৃদু পদশব্দেও তাহার বুকটি আশায় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বড়রাণীর হাতটাই চাপিয়া ধরিয়া বলিল এসো আলো!—বলিয়া সে ·· বড়রাণী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—ঠাকুরপো! ঠাকুরপো!

সুরেন হাত ছাড়িয়া দ্রুতবেগে ঘরে ঢুকিয়া শয্যায় আছাড় খাইয়া পড়িল।

একটু পরে, আবার কে যায়! সুরেন বাহিরে আসিয়া ডাকিল—বিন্দু?

বিন্দু নিকটে আসিতেই সুরেন জিজ্ঞাসিল—ছোটরাণী?

ছোটরাণী ত এখনও ফেরেন নি বাবু।—শুনিয়া সুরেন তখনই একটা জামা কাঁধে ফেলিয়া গাড়ীখানার দিকে চলিয়া গেল।

বিন্দু বড়রাণীকে সংবাদ দিল। বড়রাণী কাঁদিয়া কাটিয়া একাকার করিতে লাগিলেন। প্রতীকারের আশায় দেবেন্দ্রকে ঠেলিয়া তুলিতেই ঘুমের চোখে·বিজড়িত স্বরে দেবেন্দ্র কহিলেন - যাবে কোথায় বাপু! এই মন্ত্রীতেই 'মাৎ' করব।—বলিয়া পাশের বালিশটা চাপিয়া ধরিয়া স্বপ্নরাজ্যের কোন খেলোয়াড়কে মাৎ করিতে দাবা টিপিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

বড়রাণী বিন্দুকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন—কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল বিন্দু, ঠাকুরপোকে বলতে যে ছোটরাণী সেখানেই গেছে। এ বাড়ীর ঝি চাকরগুলো এমনই নচ্ছার……

বিন্দু গোঁ হইয়া বলিল—আমি কি তোনাকে সেই কথাই বলেছি না-কি! ছোটরাণী ঘরে নেই—তাই ত বলেছি। বাবা, সাতজন্ম যেন বড় নোকের বাড়ী কেউ নকুরী না করতে আসে।

আর খেদ করতে হ'বে না,—দূর হ' আমার সামনে থেকে। বলিয়া বড়রাণী রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

একবার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গাড়ীখানায় গিয়া সুরেনের হাতটা ধরিয়া ফিরাইয়া লইয়া আসেন! কিন্তু যদি সে কথা না রাখে। দেবেন্দ্র হইলে ফিরাইতে পারিত, কিন্তু হায়! বড়রাণীর সে দিকেও কোন আশা ছিল না।

তবুও বড়রাণী স্থির হইতে পারিলেন না। আল্ থাল্ বেশে সিঁড়ি বহিয়া নামিতেছেন, ঈশ্বরাকে কাঁদিতে কাঁদিতে সিঁড়িতে উঠিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—সে এইমাত্র প্রহৃত হইয়াছে, ছোট-রাণী কখন বাহিরে গিয়াছেন—সংবাদ দিতে পারে নাই বলিয়া!—কান্নাটা একটু থামাইয়া ঈশ্বরা বলিল—হ্যাঁ বড়মা আমি ত রমলা দিদির বাড়ী গেছলুম, আস্‌তে রাত বারোটা হ'য়ে যায় নি? আমি জানব কোত্থেকে!

বড়রাণী কথা কহিতে পারিলেন না। গাড়ীখানার মোটর ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল, বড়রাণী দ্রুতপদে নামিতেছেন—ভোঁ ভোঁ শব্দ করিয়া মোটর ফটক পার হইয়া বাহির হইয়া গেল।

বড়রাণী দু'হাতে বুক চাপিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানেই বসিয়া পড়িলেন।

বার দুই 'আলোক' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে বড়রাণী সংজ্ঞা হারাইয়া ভূতলে লুঠাইয়া পড়িলেন।

—২০—

রাস্তায় তখন অগণিত ফেরিওয়ালার ডাকে দিনমান সচকিত হইয়া উঠিয়াছে। বদ্ধ দ্বার জানালার ভিতর দিয়াই শীতের নম্র রৌদ্র-কিরণও যেন চোখ দুটিকে জ্বালাইয়া দিতেছে. দু'হাতে বুক চাপিয়া এই কথাটি ভাবিতে ভাবিতে সে উঠিয়া পড়িল—যে আজ আর অজয় হেদোর পুকুরে পড়িয়া নাই, আজ আর মেয়ে স্কুলের ছাদের বায়সকুল তাহার সমাধি ভঙ্গ করে নাই—আজ আর আলোক হারানো সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবে না!

যেন কুমুদ তাহার মহামূল্য নিধি হাতে হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিল, অবহেলায় অহঙ্কারে, ভুলের বশে তাহা সে খোওয়াইয়াছে তাই উঠিয়া বসিতেই টস্ টস্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল বুকের 'পরে ঝরিয়া পড়িল।

পূর্ব্বদিকের জানেলা বিদীর্ণ করিয়া সূর্য্য কিরণ যেন সতেজে ঢুকিতে চাহিতেছিল, সেই আলোকে প্রথম নয়ন উন্মীলন করিতেই দেওয়ালে টাঙ্গানো পরমহংসদেবের সহাস সুন্দর আনন তাহার চোখে পড়িয়া গেল। চিত্র বেষ্টন করিয়া অনেকদিনের শুষ্ক একগাছি পুষ্পমাল্য বায়ুভরে ঈষৎ দুলিতেছিল, আলোক দু তিন মিনিট স্থির নেত্রে সেদিকে চাহিয়া

থাকিয়া, নত হইয়া করজোড়ে প্রণাম করিয়া উঠিতেই দেখিল, মালাশুদ্ধ ছবিখানিও যেন দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। যেন সে চিত্র নয়, ভগবানের প্রত্যক্ষ স্বরূপ—এই ভাবিয়া আলোক পুনর্ব্বার নত হইয়া প্রণাম করিল।

মধু চেক্ র‍্যাপার খানি গায়ে জড়াইয়া দরজার বাহিরেই বসিয়াছিল আলোকের পায়ের শব্দে দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার চোখে মুখে বিস্ময়ের অতি সূক্ষ্ম কুঞ্চিত রেখাগুলি আলোকের চক্ষে পড়িতেই আলোক মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল—শোফেয়ারকে ডাক্।

শোফেয়ার আসিতেই বলিল—দক্ষিণেশ্বর যেতে আসতে কত সময় লাগবে বলতে পারেন?

শোফেয়ার হিসাব করিতে করিতে জিজ্ঞাসিল—সেখানে দেরী হ'বে কি?

দেরী! তা হ'তে পারে বৈ কি!

কতটা দেরী হইবার সম্ভাবনা তাহা সে-ই জানে না, অন্যকে বলিবে কি! শোফেয়ার একমিনিট পরে বলিল—যেতে আস্‌তে মিনিট কুড়ী লাগ্‌তে পারে। এর বেশী নয়।

আলোক মধুর দিকে চাহিয়া বলিল—দক্ষিণেশ্বর থেকে আমি বাড়ী যাব। যদি দরকার হয় সেইখানেই আমার দেখা পাবি। বুঝলি?

বুঝিয়াছে—বলিয়া মধু ঘাড় নাড়িল এবং আরো কিছু বলিবে এইভাবে হস্ত কণ্ডুয়ণ করিতেছে দেখিয়া আলোক জিজ্ঞাসিল—কি বলছিস কী?

মধু সভয়ে উত্তর দিল—রাত্রে বাড়ী থেকে জমাদার······

বড়রাণীই ব্যস্ত হইয়া লোক পাঠাইয়াছেন ভাবিয়া মধুকে ভর্ৎসনার স্বরে বলিল—বলে দিতে পারিস নি, এখানেই শুয়েছি আমি !

তাই ত বলেছি আজ্ঞে।

শোফেয়ার ট্যাঙ্কে পেট্রোল ঢালিয়া তৈয়ারী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আলোককে দেখিয়াই বাম হস্তে দরজা খুলিয়া দিল। নিষ্কর্ম্মার দল তখনও সামনের রোয়াকটায় বসিয়া যুগপৎ ধূম্র ও রৌদ্র উপভোগ করিতেছিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে মধুকে সসব্যস্তে আসিতে দেখিয়া শোফেয়ার গাড়ী থামাইতেছিল, ছোকরা দলের শাণিত দৃষ্টি কল্পনা করিয়াই আলোক বলিল—কিচ্ছু দরকার নেই হতভাগা পাজীর। চালান আপনি—যত জোরে পারেন।

মধুর পাশ দিয়াই মোটর হুস্ করিয়া চলিয়া গেল—সে বেচারা অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আপন মনে গজ গজ করিতে করিতে ঘরে ঢুকিয়া শুইয়া পড়িল।

বাগবাজারের পোল পার হইয়াই শোফেয়ার মোটরের অ্যাক্সিলেটর চাপিয়া ধরিল, গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছে, আলোক কিন্তু কোনদিকে দেখিতেছে না, চক্ষু বুজিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার একাগ্রতা ভাঙ্গিল—শোফেয়ারের ডাকে। শুনিল, সে জিজ্ঞাসিতেছে—এখানেই রাখব ?

মন্দিরে ঢুকিবার দরজাটি দেখা যাইতেছিল, আলোক বলিল—থাক্। এইখানেই নামছি।

শোফেয়ার গাড়ীর মুখ ঘুরাইয়া, ডান হাতে দরজাটি খুলিয়া দিল।

সে নামিল, কিন্তু নামিয়াই মন্দিরের যে দরজায় কম করিয়া বিশ

ত্রিশ বার অবাধে সানন্দে পার হইয়া গেছে আজ আর সে দিকে পা বাড়াইতে সাহস হইল না। কেমন করিয়া তাহার মন যেন জানিতে পারিয়াছিল, মন্দিরে সে থাকিবে না, লোকালয় তাহার স্থান নয়। যদি সে কোথাও থাকে তবে ঐ পঞ্চবটীতলে ; নয় ত সেই শেষ প্রান্তে বনের ধারে।

সে স্থান হইতে পঞ্চবটী অধিক দূর নয়, সেইটুকু পথই আলোক পাঁচ মিনিটে আসিল। দু'টি আসন্ন জলভারাক্রান্ত চক্ষুর সম্মুখে বটের ঝুরির পাশ দিয়া প্রভাত বায়ুতে কয়েকটি বৃন্তচ্যুত পত্র ঝুর ঝুর করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। পোর্টকমিশনারের একখানা ফেরি ষ্টীমার ঘড় ঘড় করিয়া আসিতেছিল--কেবলমাত্র তাহারই মধ্যে মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা যাইতেছিল। আর সব দিক খুঁজিয়া শ্রান্ত চোখের পাতা হতাশে ভরিয়া গেল, কোথায় ছিল তার এত বেদনা আর কোথায় ছিল কোন্ সাগরের এত জল,—আলোক আর চাহিতে পারিল না।

এক বুড়ী ঝরা পাতা কুড়াইতে আসিয়াছিল, সানের উপরে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী এক নবীনা রমণীকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া একটু অগ্রসর হইয়া আসিল। আজ এই প্রথম নহে, আরো কয়েকবার এরকম দেখা গিয়াছে। এই মাসখানেক আগেও একটা মাগী নেশা করিয়া এমনি পড়িয়াছিল—যাহাদের সঙ্গে সগর্ব্বে মোটরে চড়িয়া আসিয়াছিল, তাহারা কেহই নাই, এক বসনে এই গাছতলাতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া সে কাঁদিতেছিল! সেইদিনই দুপুর বেলা কয়েকটি কলেজের ছেলে আসে, তাহাদেরই একজন ভাগ্যে দয়াপরবশ হইয়া গাড়ীভাড়া করিয়া লইয়া গেল তাই, নইলে এমন চারটে পয়সাও ছিল না যে ষ্টীমার ভাড়া দেয়।

বুড়ী বড় আশায় ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হাত-পায়ের বল কমিয়া আসিল। বর্ষনসিক্ত মেঘের এক চমকেই তাহার কৌতূহলোন্মত রসনা একবারে গলার মধ্যে আড়ষ্ট অসাড় হইয়া গেল। এই বৃক্ষতলশায়িত অভাগিনীর অলঙ্কারের শোভা একটুও কমে নাই; এবং কোন নরাধম পাষণ্ড পরিত্যক্ত হইয়া যে এই সর্ব্ব শোভাময়ী এখানে পড়িয়া নাই, তাহা সেই জলভরা চোখের চাহনিতেই বুড়ী হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিয়াই, ঝুড়ীটি তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বুড়ীও চলিয়া গেল, আলোকও দাঁড়াইয়া উঠিল। গঙ্গার ধার দিয়া আর একটা ছোট পথ মন্দিরের ঘাটে আসিয়া মিশিয়াছে, সেই পথে আসিয়া আলোক গঙ্গাজল স্পর্শ করিল। অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া মুখ চোখ ধুইয়া ফেলিল—বার বার সর্ব্বকলুষনাশিনী ভাগিরথীর জল মাথায় সিঞ্চন করিয়া সে ধীরপদে মন্দিরাভিমুখে চলিল। মন যখন দ্রুত চলে, পায়ের শক্তি হ্রাস হইয়া যায়—যে কেবল ভাবিতে বসে— কাজ করিতে পারে সে সকলের কম—আলোক ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল, এ তাহার কি কুবুদ্ধি জন্মিল! দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেবীমন্দির দর্শন না করিয়া কোথায় ঘুরিয়া মরিতেছিল সে! কাহার আশায়, কাহার পথে! তাহার মনে হইতেছিল এ অপরাধের যেন সীমা নাই, দেবী কখনই তাহাকে মার্জ্জনা করিবেন না। এমনই একটা ভয়ে আতঙ্কে বার বার তাহার মন শিহরিয়া উঠিতেছিল।

সেদিন ছিল একটা রবিবার, যাত্রীর সংখ্যা খুব বেশী,—মন্দিরচত্বর হইতে দেবীদর্শন হইল না। আশে পাশের লোক ঘনঘন দৃষ্টিক্ষেপ

করিতেছে ইহা লক্ষ্য করিয়াই আলোকের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল—দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সে ভিড়ের মধ্যেই আত্মনিক্ষেপ করিল। ছোকরার দল পথ ছাড়িয়া দিল, বৃদ্ধের করুণ রস উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল, সমবেত রমণীকুল অস্ফুটে এমন গুঞ্জন করিয়া উঠিল যাহাকে সহজ ভাষায় গালাগালিও বলা চলিতে পারে। সে সমস্তই উপেক্ষা করিরা আলোক দেবীদর্শনী ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে পূজারী ঠাকুর 'বিশেষ ভোগ' হাতে করিয়াই রহিলেন। যে হাত পাতিয়া ভক্তিভরে প্রসাদ লইবে সে তখন সেই দুই বাহুর বলেই বাহিরে আসিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

তখনও তাহার চোখ দুটি জ্বলিতেছিল, মন্দিরে আসিযা দেবীর সমক্ষে এ সে কি আচরণ পাইল স্বজাতি, স্ববর্ণ স্ত্রীপুরুষের কাছে! হায় হায়! ইহারা মন্দিরে আসে কেন?

প্রস্ফুটিত গোলাপ বায়ুভরে যেদিকেই হেলিয়া দুলিয়া ঢলিয়া পড়ুক ভ্রমর তাহার সঙ্গেই দুলিতে হেলিতে ঢলিতে থাকে। যাহারা মন্দিরের ভিতরে ছিল অত্যন্ত ব্যস্ততাপ্রযুক্ত হুড় হুড় করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই আলোক একেবারে আগুনের হলকার মত পাশের শূন্য মন্দিরটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। এবং সে আগুন সেই মুহূর্ত্তেই একেবারে নিবিয়া হিম হইয়া গেল।

আলোক নয়নমার্জ্জনা করিয়া দেখিল—সে-ই। কোন কথা বলিবার আগেই অজয় শান্ত স্বরে কহিল—তুমিও এসেছ! কৈ তা ত শুনলুম না।

আলোক কিছুই বুঝিতে পারিল না। বোধ করি হঠাৎ অজয়কে

দেখিয়া সে একটু বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তখনও কোন কথা বলিতে পারিল না।

অজয় জিজ্ঞাসিল—মন্দিরে ছিলে? মাকে দেখেছ?

যেন কিছুই হয় নাই, অত্যন্ত স্বাভাবিক মিলন, এমনই ভাবে সে কথা কহিতেছে কিন্তু তাহার এই শান্ত স্থিরতাই আলোককে অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত করিয়া তুলিতেছিল, সে কথা ত কহিতে পারিলই না; মুখটি তুলিয়া না পারিল বক্তাকে দেখিতে, না পারিল রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির পদতলে নিজের কামনা—বেদনার শেষ ভক্তি অশ্রু নিবেদন করিতে!

কেবল মাত্র আলোকের পায়ের দিকে চাহিয়াই অজয় সরিয়া সরিয়া আসিল, একহাতে তাহার চিবুক অন্যহাতে মাথাটি ধরিয়া তুলিয়া বলিল—দেখ অন্ধকারেও ধরেছি ত ঠিক, তুমি কাঁদছ! না না অন্ধকার বল্‌ছি কেন, তুমি যেখানে সেখানেই ত আলোক! তোমার কাছে অন্ধকারের ত বাঁচবার উপায় নেই, তা'কে যে মরতেই হ'বে! কিন্তু তুমি এত কাঁদ কেন, আলো?

আলোক দুই পা সরিয়া গিয়া আরক্তমুখে বলিল—এটা দেবতার মন্দির না?

আগে হইতেই কালীমন্দিরের পুরুষগুলার আচরণে তাহার হৃদয় দাহ সুরু হইয়াছিল, তাই এত বড় নির্ম্মম কথাগুলি বলিতে সে একটুও দ্বিধা করিল না। অজয় শুনিতে পাইল—দেবমন্দিরে আসাই আপনাদের ভণ্ডামী, আর দেবতার আরাধনা করবার যোগ্যতা একতিলও আপনাদের নেই।

যদি সে কথাগুলি বলিবার সময় শ্রোতার দিকে চাহিত, দেখিতে পাইত, যে একটির পর একটি কথা শেলের মত তাহার বুকে বিঁধিয়া তাহাকে যন্ত্রনায় পাংশুকুশ করিয়া তুলিতেছে কিন্তু আলোক নতমুখেই মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করিয়া পলায়ন করিতেছিল, অজয় দ্রুতপদে আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—হয়ত তোমার কথাই সত্যি আলোক ' দেবমন্দিরের যোগ্য আমরা নই, কিন্তু তুমি বুঝলে কি করে? - একটু থামিয়া সে ধরা গলায় আস্তে আস্তে বলিল—সত্যিই আমার সে যোগ্যতা নেই, নহিলে সব ত্যাগ করে এখানে এলুম, এরাই বা আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইবে কেন? হাতে পায়ে ধরে বল্লুম, রাণীর অত বড় জমিদারী অত লোক প্রতিপালিত হচ্ছে, কাজ কর্ম্ম করব, আমাকে এতটুকু ঠাঁই দিন; সেরেস্তার কাজ করব—তাতেও রাজী হয় নি। আজই হয়ত যেতে হ'ত—কিন্তু সে ত তোমাদেরই জন্যে আলোক—এই মন্দিরেই মাথা গোঁজবার স্থান আমি পেয়েছি। তোমরা নায়েবকে বলতেই তিনি একেবারে তথাস্তু! আমার যোগ্যতায় যা হয় নি, তোমাদের দয়াতেই তা আমি পেয়েছি।

আলোক রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—কে বলে দিয়েছিল আপনার নায়েবকে?

অজয় সোৎসাহে কহিল—কেন, তোমরাই! এবং এই দেবতার কেবল সামনে দাঁড়িয়েই বল্‌ছি, তিনি ত আমাদের ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনতেন না, তোমার জন্যেই······

কথাটার গলা টিপিয়া ধরিবার জন্য আলোক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিল—তাহ'লে এখানেই থাকছেন আপনি? ঘর দোর?

সে ব্যবস্থাও তোমরাই করবে। কোন একটা স্বদেশ হিতকর কার্য্যে,

এই জাতীয় বিদ্যালয় কি এমনি কিছু—আজকাল যা দরকার তারই সামান্য একটু উপকারে লাগিয়ে দিতে বলেছি। সে যাক্‌গে, আমাকে যে এখানে একটু স্থান করে দিয়েছ এর ঋণ আমি তোমাদের শুধতে পারব না, ভুলতেও পারব না। ঐ যে নায়েব ম'শায় ফিরছেন, সুরেনবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে গেছলেন!

আজ যেন জগতের যা কিছু বিস্ময়, যা কিছু অলৌকিক—সবই তাহার সম্মুখে প্রকাশ হইয়া তাহাকে বিমোহিত করিতেছিল। এক ত, যদিও সে বড় আশা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া আসিয়াছিল, তবু সে এক মুহূর্ত্তের তরে কল্পনা করিতেও পারে নাই যে তাহার সমস্ত উৎকণ্ঠা, শ্রম, শ্রান্তি এখানে এত সহজে মিটিয়া যাইবে। 'যদি দরকার হয়, একঘণ্টা পরে মধু বাড়ীতে গেলেই তাহার দেখা পাইবে'—এই কথাটাই মোটরে চড়িয়া মধুকে বলিয়া আসিয়াছিল। যদি এই একঘণ্টার অবসরেই অজয় গৃহে ফিরিয়া আসে—মধু ছুটিয়া বাড়ীতে গিয়া তাহাকে সংবাদ দিবে—এই ছিল তাহার বলিবার উদ্দেশ্য—মধু বেচারা হয় ত সে ইঙ্গিত বুঝিতে পারে নাই। ভগবান যে এত সহজে, এত শীঘ্র তাহার মনের সব আঁধার দূর করিয়া আলোকময় করিয়া তুলিবেন—এ বোধ করি সে স্পর্দ্ধা করিয়া দয়াময়ের কাছেও প্রার্থনা করিতে পারে নাই। আবার এ কী বিস্ময়! অজয় কাহার নাম করিল? সে ত এ দেশে নাই, বাঙ্গালার সীমা অতিক্রম করিয়া সে হয় ত এতক্ষণ পাঞ্জাব মেলে চড়িয়া কত দেশ দেশান্তর পার হইয়া চলিয়াছে। আলোক নিজের কানদুটিকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া, দু'তিন মুহূর্ত্ত পরে বলিয়া উঠিল—কে? কে? কার কথা বলছেন?

অজয় পুলকিত স্বরে বলিল—তুমি ত ভুল শোন নি আলো! তার নাম কি তুমি ভুল করতে পার? আর সব ভুল ভ্রান্তি হ'তে পারে, কিন্তু সুরেনের নাম ত তোমার ভুল হ'বার নয়।

যেন বিষম লজ্জার কথা, নববধূটির মত আলোক সলজ্জে মাথা নমিত করিল। হু হু করিয়া উষ্ণ রক্তস্রোত উঠিয়া সারামুখখানি অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিয়া তুলিল।

অজয় বলিল—এত লজ্জা! ছিঃ আলো, এ যে দেবতার মন্দির! দেখছ—ঐ······বলিয়া সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সেই চিরকিশোর যুগল-মূর্ত্তিকে দেখাইয়া বলিল—এখানে কি লজ্জা করতে আছে ভাই। এ-যে ·········

আলোকের মাথা যেন দুলিয়া উঠিল। আলোক তাড়াতাড়ি—ভূতলে মস্তকস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া বাহির হইবে অজয় ডাকিল—আলোক!

আলোক সিক্তনয়নে চাহিয়া বলিল—কি?

একটা অনুরোধ, বছরের একটা দিন করে' অন্ততঃ এখানে এস—দেবী দর্শন করে যেয়ো।

না বলিবার ক্ষমতা ছিল না, আলোক জিজ্ঞাসিল—কোন্‌দিন?

······মাসের সাতাশে।

মনে মনে হিসাব করিয়া আলোক বলিল—আসব।

আস্‌বে?

যতদিন বেঁচে থাক্‌ব।

একশত বর্ষ বেঁচে থাক—বলিয়া অজয় অন্যদিকে চলিয়া গেল।

তখনি ফিরিয়া থামের পাশটিতে দাঁড়াইয়া বলিল—আর একটি অনুরোধ করব ?

আলোক সজল চোখের কাতর দৃষ্টি তাহার মুখের 'পরে রাখিয়া বলিল—ও রকম করে' বলবেন না অজয়বাবু, ওতে আমার কষ্ট হয়।

অজয় আবার সস্নেহে তাহার চিবুক স্পর্শ করিল। এবার আর আলোক রাগ করিল না। অজয় অতি সন্নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার শীর্ণ হাতখানি আলোকের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া মুখের উপরে। আলোক আরো সরিয়া আসিয়া বলিল—বলুন, অজয় বাবু !

অজয় অশ্রুসিক্তস্বরে কহিল—একবার সময় মত আমার বাড়াটায় যেয়ো। একটা খবর—না থাক্।

আলোক বলিল—কাকে খবর দিতে হ'বে বলুন না।

না—থাক্।

স্নেহদিদিকে কি ?

অজয় চমকিত হইয়া বলিল—তুমি জান ?

জানি। কি বলব বলুন ?

বোলো, আমি আশ্রয় পেয়েছি। কোথায় পেয়েছি—না বল্লেও চল্‌বে। তবে আশ্রয় পেয়েছি এ সংবাদ স্নেহকে দেওয়া দরকার। বলে দিয়ো।

বল্‌ব।

আর একটা কথা, তোমাকে বছরে একটি দিন দেখ্‌তে পাব, কাছে পাব।—আলো ?

সে ত বলেছি অজয় বাবু, আমি আসবই।

তা বলেছ ! আলোক, সেইদিন……

তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া আলোক চঞ্চল হইয়া বলিল—কৈ অজয় বাবু, বল্লেন না ?

অজয় তাহার মুখে চাহিয়া স্খলিত বচনে কহিল—সেইদিন কুমুদ হ'য়ে এসো।

প্রথমটা আলোক চমকিয়া উঠিল, যেন বুঝে নাই—এমনি ভাবে মাথাটি নড়িয়া উঠিল। তখনি অজয়ের বুকের পরে হাতটি রাখিয়া বলিল—আপনি সেদিন আমাকে কুমুদ বলেই ডাকবেন।—যেন স্বর্গ হাতে পাইয়াছে, পাছে অসতর্ক মুহূর্ত্তে খোয়া যায় এরই ভয়ে, অজয় দ্রুতপদে সরিয়া গেল। আলোক অল্পক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া মন্দির ত্যাগ করিল।

যত দ্রুতপদেই আসুক মোটরের পার্শ্বে সুরেনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার যেন চোখের তেজ লুপ্ত হইতেছিল, মনের বিকারই হোক অথবা অকস্মাৎ প্রিয়জনমিলনানন্দেই হোক—চোখের পাতা মনুষ্য হস্তস্পৃষ্ট লজ্জাবতীর মত মুদিয়া আসিতেছিল—সুরেন হাতটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল—এস। বেলা অনেক হয়ে গেছে। এই গাড়ীটাতেই যাওয়া যাক্ নিজেরা ড্রাইভ্ করে'—কি বল ?

সে বলিবে কী—কেবল সুরেনের প্রসারিত হাতের জোরেই মোটরে উঠিয়া গদীর উপর ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

সুরেন উঠিয়া বসিয়া বড় গাড়ীর শোফেয়ারকে গাড়ী লইয়া চলিয়া যাইতে বলিল।

আলোক বলিল—তুমি দিল্লী যাও নি ?

সুরেন সহাস্যে বলিল—ট্রেণ ফেল্ করিয়ে দিলে দিল্লী ত দূরের কথা লিলুয়া যাওয়াই হয় না।

কে ফেল্ করিয়ে দিলে ?

তুমি! কাল রাত্রে······মনে নেই ?

তখনই ফিরেছ ?

ঘণ্টা পাঁচেক পরে। প্রায় শেষ রাত্রে।

বড় গাড়ীর ধুলায় স্থানটা ভরিয়া গিয়াছিল, আলোকের যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইবে, বুকের মধ্যে এমনি একটা অশ্বস্তিভাব বোধ করিতেছিল—এবং সে যে কি ও কেন বুঝিতে পারিয়াই বিগত রজনীর সব কথা বলিবার উপক্রম করিতেছে, সুরেন গাড়ীটা চালাইয়া দিয়া বলিল—অজয়ের সঙ্গে দেখা হ'য়েছে ? হয়েছে! কি বল্লে ? সত্যি—বেচারা বড় কষ্ট পেয়েছে। কিছু বল্লে ?

আলোক কোমলকণ্ঠে বলিল—তোমার কথাই বল্লেন······

বাধা দিয়া সুরেন রায় জিজ্ঞাসিল—আর কিছু ?

আলোক মুখ তুলিয়া বলিল—দিদি যান্ ২৭শে, ফি বছরের······ মাসের সাতাশে তারিখে আমাকে একবার করে' আস্‌তে বলেছেন।

সুরেন হাসিয়া বলিল—এইটেই হ'ল পাগলামী। আমাকেও বলছিলেন।

আস্‌তে ?

না, না, তোমাকে অনুরোধ করতে। তখন ত তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি কি না।

একমিনিট পরে সহসা আরক্তমুখে আলোক জিজ্ঞাসিল—আসব ?

আস্‌বে বৈ কি! আমি ত তাঁকে বলেই এসেছিলুম যে এ অনুরোধ অবহেলা করতে আলোক পারবে না, অন্ততঃ করবে না। আর দক্ষিণেশ্বরে আস্‌তে ত তুমি বড়ই ভালোবাস।

বাগানের গাছপালার অন্ধকার ও বড়গাড়ীর পিছনের ধুলা অতিক্রম করিয়া তাহাদের গাড়ী মুক্ত আলোকে সোজা পথে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিল। আলোক বার দুই মাত্র সুরেনের মুখের পানে চাহিয়া স্নিগ্ধ-সহজ মনে পথের ধারের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

সুরেন বলিল—তোমার মুখে যে রোদ লাগ্‌ছে আলো, থামিয়ে হুড্‌টা তুলে দিই?

আলোক তাহার হাত চাপিয়া বলিল—তা লাগুক রোদ। এত আলো থাক্‌তে হুড্‌ তুলে অন্ধকারে মুখ গুঁজে আমি যেতে পারব না।

তবে থাক্—বলিয়া সুরেন একটি সিগারেট ধরাইয়া ফেলিল। দু'টি হাত চাকায় আবদ্ধ, মুখে সিগারেট, যা দু'একটি কথা সে বলিতেছিল, আলোক তাহা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া খপ্‌ করিয়া সিগারেট-টা টানিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—নাই বা খেলে কিছুক্ষণ! একে ধূলোয় পথ অন্ধকার। তার ওপর আবার ধোঁয়া!

সুরেন বামহাতে আলোকের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলিল—কোথায় অন্ধকার! আমার যে সব আলো, আশে আলো, পাশে আলো, হৃদে আলো, মনে আলো—আমি ত কোথায় আঁধার খুঁজে পাচ্ছিনে—বলিয়া ঠোঁটের পাতায় তামাকের টুকরাগুলি থু থু করিয়া ফেলিয়া দিয়া দ্বিপ্রহরে, খোলা পথে যে কাণ্ডটি করিয়া বসিল তাহা আর আমি কোনমতেই লিখিয়া উঠিতে পারিলাম না।

অল্পক্ষণ পরে আলোক জিজ্ঞাসিল—আবার কবে দিল্লী যাবে?

আর যাব না।

সত্যি?

সত্যি। তোমাকে ছুঁয়ে—সত্যি!

কেন? বল-না, ওগো, বল, বল, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি বল।

বল্‌লে বিশ্বাস করবে?

করব না! নিশ্চয় করব।

সুরেন আবার মুখ ফিরাইয়া, মুখটি মুখের কাছে আনিয়া বলিল—তুমি পছন্দ কর না, তাই, আলো—কথার শেষেই নববিবাহিত লোভী যুবকের মত আবার সে আলোকের মুখখানি রাঙা করিয়া দিল।

আঃ বাঁচলুম! আর যেন মত না উল্টে যায়!—হাসিতে নির্জ্জন পথ সচকিত করিয়া, আলোক সাদরে সুরেনের কাঁধের উপর মাথাটি রাখিল।

সুরেন আর কিছু বলিল না, কেবলমাত্র রৌদ্রদীপ্ত সেই সুকোমল সুন্দর মুখের প্রত্যেক রেখাটি মনের তুলিকায় আঁকিয়া লইয়া গাড়ীর কল কব্জায় মননিবেশ করিল।

সমাপ্ত